সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান ৪

প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের বিজ্ঞান

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

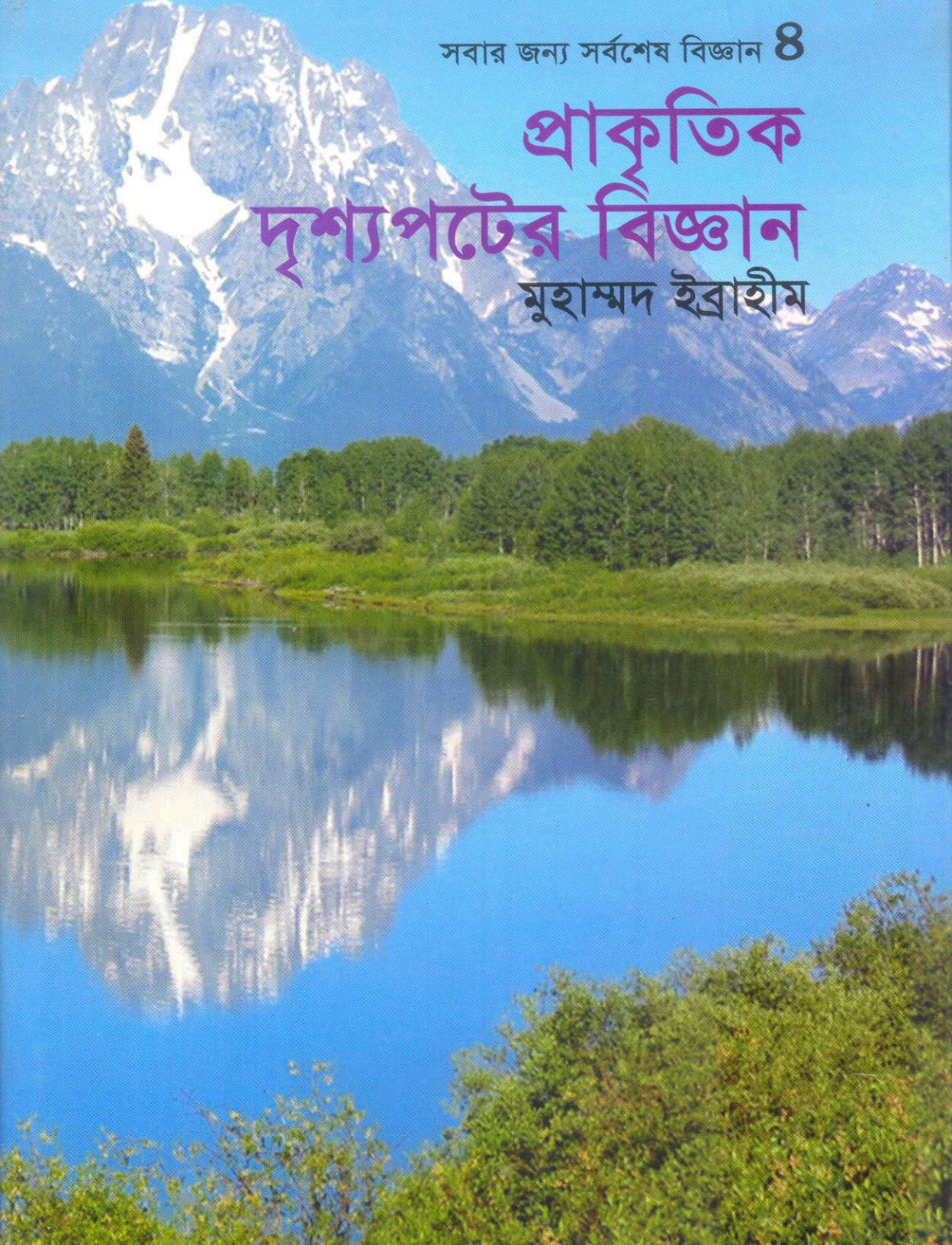

সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদেরকে আকৃষ্ট করে। যদিও আমরা বলি ছবির মত দৃশ্য, তবুও দৃশ্যপট কিন্তু ছবির মত নির্জীব নয়– বরং খুবই সজীব, খুবই সচল, খুবই কার্যকর। দৃশ্যপটের সজীবতার মূল নায়ক হলো উদ্ভিদ ও প্রাণিরা; তারা এবং এর ভূমি, পানি, বাতাস ইত্যাদির গঠন ও চলাচল দৃশ্যপটকে গড়ে তুলছে দিন দিন তিল তিল করে। এর অভ্যন্তরে এই জীবন নাটককে বুঝার ব্যবস্থা করে দিয়েছে দৃশ্যপটের বিজ্ঞান।

দৃশ্যপটের বহিরঙ্গে থেমে না গিয়ে এর ভেতরে ঢুকলে দেখতে পাব এটি একটি বহু-মহলা বাড়ির মত যার খোপে খোপে রয়েছে জীব - বৈচিত্র; এ যেন একটি প্রাকৃতিক নক্সী কাঁথা– যার রয়েছে জমিন, তালির টুকরা, এবং সূঁচের রেখার সমতুল্য উপাদান সমূহে গড়ে উঠা সৌকর্য। সেখানে আমরা দেখি মানুষ নিজেই এর স্থিতি-অস্থিতির যুদ্ধে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের নির্বুদ্ধিতায় চিরায়ত এই দৃশ্যপটের অবক্ষয় ঘটিয়ে আমরা নিজেদের জন্যও ডেকে আনতে পারি সর্বনাশ। দৃশ্যপটের বিজ্ঞান তাই এর আভ্যন্তরীণ জীবন-নাট্যে চমকপ্রদ অবগাহন শুধু নয়, আমাদের ভবিষ্যতের বিচক্ষণ রোড-ম্যাপ সন্ধানও বটে।

উৎসর্গ

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) ব্যাপক
কর্মযজ্ঞে যারা সর্বক্ষণ নিজেদেরকে
নিয়োজিত রেখেছে তাদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদেরকে আকৃষ্ট করে। পর্যটক হিসেবে আমরা যেমন নূতন নূতন দৃশ্যপটের সৌন্দর্য উপভোগ করি, তেমনি দৃশ্যপট নিয়ে আঁকা ছবিরও চিরকাল আমরা গুণগ্রাহী। জরিপে দেখা গেছে, সব দেশের সব সংস্কৃতির মানুষের কাছেই আদর্শ আবাস সম্পর্কে মনের আকাঙ্খা কিন্তু একই রকম। সবাই চায় বৃক্ষ সুশোভিত অঞ্চল, শান্ত জলাশয়, গাছে গাছে পাখির গান, প্রাণির চারণ ইত্যাদি। আবার ধূধূ মরু, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, তুষার আবৃত পর্বত এমন সব ব্যতিক্রমী বিচিত্র দৃশ্যপটও প্রবলভাবে আমাদেরকে আকর্ষণ করে। যদিও আমরা বলি ছবির মত দৃশ্য, তবুও দৃশ্যপট কিন্তু ছবির মত নির্জীব নয়– বরং খুবই সজীব, খুবই সচল, এবং খুবই কার্যকর। আমরা যা দেখে মুগ্ধ হই তা কিন্তু এমনি এমনি তৈরি হয়ে যায়নি। দৃশ্যপটের অভ্যন্তরে নিত্য যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে তার মাধ্যমেই দৃশ্যপট তৈরি হচ্ছে, ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে; কখনো দীর্ঘ দিন ধরে তা ঘটছে, কখনো বা হঠাৎ বিপর্যয়েও নূতন কিছু ঘটেছে। এর মধ্যে ভূমি, পানি, বাতাস ইত্যাদির গঠন, চলাচল ওসবের গুরুত্ব রয়েছে বটে, কিন্তু দৃশ্যপটের সজীবতার মূল নায়ক উদ্ভিদ ও প্রাণিরা। তারা সেখানে মোটেও অলঙ্কার হিসেবে নেই, বরং তারাই দৃশ্যপটকে গড়ে তুলছে প্রতিদিন তিল তিল করে। ছবির মত দৃশ্যপট দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে ওখানেই থেমে যেতে পারি। কিন্তু আবার আরো কিছু করতে পারি– দৃশ্যপটের অভ্যন্তরে যে জীবন-নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে তা দেখার ও বুঝার চেষ্টা করতে পারি। সেটি কিন্তু আরো অনেক বেশি চমকপ্রদ ও আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ– আমাদের জীবনের জন্য ও আমাদের আবাস এই পৃথিবীর জন্য। আর সেটি করার উপায় হলো দশ্যপটের বিজ্ঞানের মধ্যে অবগাহন করা।

দৃশ্যপট যে সৃষ্টি হয়েছে, পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, তা লক্ষ বছরের জীব বিবর্তনের অংশ। সে ভাবে দেখতে গেলে এরা বহু মহলা বাড়ির মত যার খোপে খোপে সৃষ্টি হয়েছে বিচিত্র জীবের ভূবন। এর যে বিজ্ঞান তাকে আমরা এতদিন ইকোলোজি বা বাস্তুবিদ্যা হিসেবে দেখেছি; এখন দেখছি দৃশ্যপটের বিজ্ঞান হিসেবে। ঐ ইকোলোজির ঘটনাগুলোই– নানা কিছুর আন্তক্রিয়া, তাদের প্রবাহ আর পথচলা ইত্যাদি দৃশ্যপটকে

গড়েছে একটি প্রাকৃতিক নক্সী কাঁথা হিসেবে। এর বিভিন্ন উপাদান যেগুলো অনেকটা কাঁথার জমিন, তার তালির নানা টুকরা, আর সূঁচের রেখার সমতুল্য- সেগুলো দৃশ্যপটে এক রকম স্থিতি-অস্থিতির যুদ্ধ সৃষ্টি করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে মানুষ নিজেই এক বড় নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই নায়ক তার হাতের ব্যবস্থাপনার গুণে দৃশ্যপটকে যেমন তার চিরায়ত সৌন্দর্যে ও ফলপ্রসূতায় অক্ষুণ্ন রাখতে পারে, তেমনি আবার একে অবক্ষয়িত করে নিজের ধ্বংসও ডেকে আনতে পারে। দৃশ্যপটের বিজ্ঞান তাই তার সুন্দর সৌকর্যের কারণে শুধু নয়, পৃথিবীর ও মানুষের ভবিষ্যতের কারণেও গুরুত্বপূর্ণ।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে কী আছে? ॥ ৭

বহুমহলা বাড়ি ও তার বাসিন্দারা ॥ ১৯

প্রকৃতির নক্সী কাঁথা ॥ ৩৭

দৃশ্যপটের গড়ে ওঠা ॥ ৬১

নানা প্রবাহ, নানা পথচলা ॥ ৭৫

নক্সী কাঁথার স্থিতি-অস্থিতি ॥ ৮৬

সমুদ্রের অনন্যা দৃশ্যপট: প্রবাল দ্বীপ ॥ ৯৫

দৃশ্যপট ব্যবস্থাপনা ॥ ১০১

প্রকৃতি-প্রেম: দৃশ্যপট বিজ্ঞানের একটি প্রেরণা ॥ ১১৮

প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে কী আছে?

প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ

পৃথিবীর নানা অঞ্চলের নানা রকম সংস্কৃতির মানুষের উপর, এমনকি গভীর বনের আদিবাসীদের উপরও গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে নিজের জন্য আদর্শ সুন্দর আবাস কী রকম হওয়া উচিত এ বিষয়ে সবাই একমত। সবাই চায় বৃক্ষ সুশোভিত স্থান তবে গভীর বন নয়, বরং সামনে উন্মুক্ত ক্ষেত্র নদীর স্রোত বা হ্রদের জলাশয়– পানিতে মাছ, গাছে পাখির গান, মাঠে তৃণের আন্দোলন, গরু-হরিণ বা এমনি প্রাণির চারণ– এসবই সবার পছন্দ। সব সভ্যতায় যুগে যুগে শিল্পীরা দেবদেবী, মানুষ, জীবজন্তু এদের ছবি যেমন এঁকেছেন তেমনি নিপুণ তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন ঐ আদর্শ প্রাকৃতিক দৃশ্যের নানা ছবি।

বিজ্ঞানের ভাষায় মানুষের এই প্রকৃতি প্রীতিকে বলা হয় বায়োফিলিয়া অর্থাৎ জীবপ্রেম– গাছপালা-জীবজন্তুর প্রতি একটি সহজাত আকর্ষণ, যা নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরে নয়। এর কারণ সম্পর্কে সব চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি হলো এই জীবপ্রেমটি বিবর্তনের সূত্রে আমরা আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি। যে যুগে মানুষের মস্তিষ্ক বিকশিত হচ্ছিল তখন আদি মানুষের বাস ছিল আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমিতে। বিবর্তনে সেই পরিবর্তনগুলোই ক্রম বিকশিত হয়েছে যেগুলো টিকে থাকার ও বংশ বৃদ্ধির জন্য সব চেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছে। বৃক্ষ সুশোভিত, পশু-পাখি আর জলাশয় সমৃদ্ধ ঐ তৃণভূমিই সেদিন খাদ্য, আশ্রয়, আত্মরক্ষা– সব দিক থেকে টিকে থাকার সহায়ক ছিল। কাজেই আমাদের মস্তিষ্ক তখন থেকেই এমনি দৃশ্যপটকেই আদর্শ মনে করেছে, ভালবাসতে শিখেছে। এই তত্ত্বকে বলা হয় সাভানা তত্ত্ব।

হয়তো পূর্বপুরুষের সেই জীবনের বাধ্যবাধকতাকে ভালবাসা হিসেবে মস্তিষ্কে ধারণ করে আমরা আজও প্রকৃতি-পরিবেশে মুগ্ধ হই। সুন্দর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলে আমরা বলি ছবির মত সুন্দর। প্রকৃতির দৃশ্যপট কিন্তু মোটেই ছবির মত নির্জীব কিছু নয়- বরং খুবই সজীব, খুবই সচল, খুবই কার্যকর একটি অস্তিত্ব। দৃশ্যপটের

অন্তর্নিহিত এই সজীব বিষয়গুলোকে উন্মোচন করাটাই এই বইটির মূল উদ্দেশ্য। শিল্পীর তুলির টানে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বহিরঙ্গটি যে ভাবে সংক্ষেপে ফুটে উঠে, অথবা দূর থেকে আমরাও যেভাবে এ দৃশ্যকে উপভোগ করি তাতে আমরা অপার আনন্দ লাভ করি বটে, কিন্তু এই দৃশ্যপটের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানের উন্মোচন কিন্তু আরো চমকপ্রদ। এর কারণ তখন আমরা নিজেদেরকেও এর অংশ হিসেবে ভাবতে পারি; এবং বুঝতে পারি প্রকৃতির নানা অনুসঙ্গ এবং আমরা নিজেরাও কী ভাবে এ দৃশ্যপট সৃষ্টি করে চলেছি, কী কারণে এগুলো এই রূপ নিচ্ছে, কী ভাবে এর মধ্যে অনেক রকম জীবের জীবন-নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে, কী কী কারণে এই দৃশ্যপট ধীরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের একটি বড় নায়ক আমরাও বটে, এবং আমাদের হাতের ব্যবস্থাপনায় এটি যেমন তার নিজস্ব সেই চিরায়ত রূপে বিকশিত হতে পারে আবার অবক্ষয় ও ধ্বংসের দিকে গিয়ে আমাদেরকেও বিপন্ন করে তুলতে পারে।

প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে এবং এর উপর পৃথিবীর ও আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বলে বিজ্ঞান গবেষণায় এটি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে বিষয়টি অপেক্ষাকৃত খুবই নূতন। আগে অবশ্য কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা ইকোলজি বা বাস্তুবিদ্যার আওতায় এর অনেকগুলো বিষয়ের চর্চা করেছি। কিন্তু দৃশ্যপটের বিজ্ঞান বিষয়গুলোকে একটি নূতন মাত্রা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন মূল ধারার গবেষণাগুলোর– যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা বা জীববিদ্যার আধুনিকতম জ্ঞানের প্রয়োগেই সম্ভব হচ্ছে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের অন্তর্নিহিত রহস্যের এই উদ্ঘাটন। এদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এর প্রসঙ্গে নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

অধিকাংশ সময় আমাদের কাছে প্রকৃতির যে দৃশ্যপট ধরা পড়ে তা স্থল ভাগকে নিয়েই; যদিও তার মধ্যে জলাশয়ের অবস্থানকেও গ্রাহ্য করা হয়। স্থলের সঙ্গেই আমাদের আদান প্রদান ঘনিষ্ঠতা বেশি। এই বইয়ে তাই স্থলের দৃশ্যপটের ভিত্তিতেই অধিকাংশ আলোচনা আমরা করবো। কিন্তু পৃথিবীর বৃহদাংশ যে জলভাগ সেই সামুদ্রিক প্রকৃতিকেও মোটেই অবহেলা করছেনা এই বিজ্ঞান, তার একই রকম

গুরুত্বের কারণেই। বইয়ের শেষের দিকে আমরা জলভাগের দৃশ্যপটের খোঁজ নেব প্রধানত তার একটি চমকপ্রদ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রসঙ্গে– তা হলো প্রবালদ্বীপ।

দৃশ্যপটের উপাদানগুলো

শহরের বাইরের গেলেই সাধারণত প্রকৃতিতে যে দৃশ্য আমাদেরকে প্রথম স্বাগত জানায় তা হলো বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। সেই দৃশ্যপটকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে যদি তার যে কোন একটি জায়গায় গিয়ে স্থানীয় ভাবে লক্ষ্য করি ওখানে স্বল্প দূরত্বের মধ্যেই পাশাপাশি আমরা পেয়ে যাব চাষের জমি, তার কিনারায় আইল– যেখানে হয়তো কিছু অনুচ্চ উদ্ভিদের ঝোপের সারি, কিছু গাছপালার কুঞ্জও, তারপর হয়তো পায়ে চলা পথ– যা মিশেছে গাড়ি চলার সড়কে; পাশে কৃষকের পাম্পঘর, নালা বা খাল, পাহারার টং ঘর– এসব থাকাও স্বাভাবিক। এগুলোর প্রত্যেকটিকে অন্যটির থেকে আলাদা এক একটি জীব বসত সিষ্টেম হিসেবে নেয়া যায় যাকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ইকো-সিষ্টেম। বিভিন্ন রকম ইকো-সিষ্টেমের যে সমন্বয় এখানে আমরা দেখলাম তাকে বলতে পারি একটি ইকো-সিষ্টেম গুচ্ছ।

কৃষি দৃশ্যপট

ঐ কৃষি দৃশ্যপটের অন্য যে কোন স্থানে গিয়ে যদি দেখি সেখানেও এরকম আর একটি গুচ্ছ পাব যা সাধারণ ভাবে আগেরটির চেয়ে খুব একটি ভিন্ন নয়। হয়তো সেখানে বৃক্ষকুঞ্জটি নেই, আবার হয়তো রয়েছে একটি পুকুর, কিংবা হয়তো এর পাশ দিয়ে গেছে একটি বড় মহাসড়ক। এসবের কোনটি কত সংখ্যায় আছে সেটি গুণেও ফেলতে পারি আমরা। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম জায়গায় গিয়ে খোঁজ নিলেও হয়তো একই রকম গুচ্ছ পাব।

কিন্তু এমন একটি জায়গা শেষ পর্যন্ত আসবে যেখানে ইকো-সিষ্টেম গুচ্ছের উপাদানগুলো আর আগেরগুলোর সঙ্গে মিলবেনা। এখানে হয়তো রয়েছে জন বসতি, গ্রাম, বাজার, স্কুল, স্কুলের মাঠ, পাশে একটি জংলা, এমনকি রেল রাস্তা, ষ্টেশন। এতক্ষণ গুচ্ছের পর গুচ্ছ যা দেখছিলাম হঠাৎ ইকো-সিষ্টেম গুচ্ছটি বেশ বদলে গেল। আবার বেশ দূরে অন্যত্র হয়তো পাব সম্পূর্ণ ভিন্ন গুচ্ছ– পাহাড়, টিলা, বন, উঁচু-নিচু ভূমিতে অন্যরকম গাছ পালা, নদী ইত্যাদি। গুচ্ছের এই পরিবর্তনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বদলে গেছে দৃশ্যপট। এসব গুচ্ছের যে কোন একটিতে যদি আমরা কিছুটা মনোযোগের সঙ্গে অনুসন্ধান করি তা হলে দেখবো ওর মধ্যে ইকো-সিষ্টেমগুলো একেবারে আলাদা আলাদা হয়ে নেই, তাদের মধ্যে যথেষ্ট লেনদেন আছে। যেমন প্রথমটিতে পাম্পঘর থেকে পানি নালা বেয়ে জমিতে যাচ্ছে, যে চড়ুই জমিতে ছিল সেটি গাছে গিয়ে বসছে, টং ঘর থেকে কৃষক সার নিয়ে ছিটাচ্ছে জমিতে, আইলের ঝোপ থেকে ফুলের রেণু ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তা ছাড়িয়ে অন্য জমিতে। একই ধরনের গুচ্ছগুলোতে আর একটি জিনিস লক্ষ্যনীয়: সেখানে জল-হাওয়ার প্রভাবটি যেমন একই, তেমনি ভূমি-রূপটিও একই– মাটি, পাথর যাই হোক না কেন। তাছাড়া আরো একটি ব্যাপারকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না তা হলো সব গুচ্ছে কমবেশি কিছু এলোমেলো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশ আছে। হয়তো কিছুদিন আগে কালবোশেখী ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গাছ, অথবা জমির বেগুন ক্ষেতে পোকা লেগে মরে যাওয়া বেগুন গাছ, অথবা ট্রাক্টরের ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়া মাটির রাস্তা ইত্যাদি। এই উদাহরণগুলোতে প্রথম দুটি প্রাকৃতিক হলেও তৃতীয়টি কিন্তু মানুষের সৃষ্টি। এরকম গোলমাল হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলোকে আমরা বলতে পারি বিপর্যয় (ডিসটারব্যান্স), যেগুলো দু'একদিন আগের যেমন হতে পারে তেমনি কোন কোনটি বছরের পর বছর পুরানো

হতে পারে, এমনকি কোন কোনটি হয়তো ইকো-সিষ্টেমে বহু যুগ আগে থেকেও রয়েছে– যেমন পাহাড় ধসে পড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া ছোট নদী।

দৃশ্যপটে বিপর্যয়

মোটের উপর তাই আমরা আমাদের দৃশ্যপটগুলোতে নানা ইকো-সিষ্টেমের গুচ্ছ দেখলাম এবং সাধারণ ভাবে দেখলাম গুচ্ছের ভেতর পরস্পর আদান প্রদান, একই জল-হাওয়া আর ভূপ্রকৃতির প্রভাব, আর কিছু এলোমেলো হয়ে যাওয়া বিপর্যস্ত জায়গা। এই জিনিসগুলো প্রায় সব দৃশ্যপটে থাকে, এবং আমাদের বাকি আলোচনায় এগুলো নানা ভাবে আসবে।

বৈচিত্রই সৌন্দর্য

এ পর্যন্ত আমরা যে দৃশ্যপটগুলো দেখেছি সেখানে ইকো-সিষ্টেম গুচ্ছগুলো খুব বেশি আলাদা ধরনের ছিলনা– প্রায় সবই একই অঞ্চল, জলবায়ু আর সাধারণ প্রকৃতির আওতায় ছিল। কিন্তু আরো ব্যাপক ভিত্তিতে ভাবলে ব্যাপারটি তা হবার কথা নয়। দুনিয়াতে অনেক রকমের ইকো-সিষ্টেম রয়েছে, আর সেগুলো নিয়ে দৃশ্যপট রচিত হতে পারে অনেক রকমের। এগুলোর মধ্যে প্রথম দর্শনে পার্থক্য প্রচুর। সে সব পার্থক্য আসে প্রত্যেকটির নানা উপাদানের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের পরিমাণে, মানুষের

হস্তক্ষেপ ঘটার পরিমাণে, প্রাকৃতিক প্রভাবে বিপর্যয় দেখা দেয়ার পরিমাণে, উঁচুনিচু হবার পরিমাণে ইত্যাদি বেশ কতগুলো দিক থেকে। এসবের বিবেচনায় হয়তো এদের মধ্যে তেমন কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তারপরও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এদের সবগুলোর প্রকৃতির মধ্যে এমন কী কী আছে যার ভিত্তিতে কিছু সাধারণ নিয়ম, সাধারণ তত্ত্ব গড়ে তোলা যায়।

কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে বৈচিত্রগুলো দেখা যাক। প্রথমে সার্বিক ভাবে এগুলো ভালভাবে দেখতে সহায়ক হবে যদি ছোট একটি বিমানে জায়গাগুলোর মাত্র কয়েক শ' মিটার উপর দিয়ে যদি উড়ে যাই। আসলে বিমান না হয়ে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' বইটিতে বালি হাঁসের পিঠে চড়ে মানস সরোবর যাওয়ার সময় ছোট্ট মানুষ বুড়ো আংলা বাংলাদেশের দৃশ্যপট যেমন ভাবে দেখেছিল তেমনি হলে আরো ভাল হয় (বিমানের শব্দ, বা দৃশ্যপটে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অন্য কিছু থাকবেনা বলে)।

প্রথমে আগের দৃশ্যপটে যেমন দেখেছি বাংলাদেশের একটি কৃষিভূমির দৃশ্যপট দেখা যাক। দেখবো সেই কৃষি জমির ছোট ছোট টুকরা, গ্রামের মেঠো পথ, পাকা রাস্তা, মাঝে মাঝে বসতবাড়ি, বৃক্ষকুঞ্জ ইত্যাদি। মানুষের হাতের ছোঁয়া সব জায়গায় স্পষ্ট– কর্ষিত জমি, তাতে সারি করে শস্য লাগানো, তৈরি রাস্তা, ঘর-বাড়ি সব কিছুতে। বিপর্যয়ের চিহ্নও রয়েছে এখানে ওখানে– যেমন আগের কোন ঝড়ের ফলে সৃষ্ট।

শীত প্রধান পার্বত্য দৃশ্যপট

এবার চলে যাই পৃথিবীর একেবারে উত্তরে শীত প্রধান জায়গায়। এখানে বহুদূর পর্যন্ত মানুষের চিহ্ন কোথাও দেখা না গেলেও জীবজন্তুর প্রভাব চোখে পড়ে। পাইন জাতীয় গাছের বনাঞ্চলই বেশি, কোথাও কোথাও ঐ জীবজন্তুর কারণে বন বিপর্যস্ত। বনের মধ্যে তাই টুকরা টুকরা হবার ভাব আছে। রয়েছে কিছু পর্বতাঞ্চল যার নিচের দিকের উদ্ভিদ ও আর উপরের দিকের উদ্ভিদে মিল নেই। এখানে আছে নদী স্রোত; দুটি স্রোতের মিশে এক হওয়া। কোথাও দাবানলের কারণে বিপর্যস্ত পোড়া বনের টুকরা, অথবা হয়তো কীট পতঙ্গের কারণে নষ্ট বন।

আমাজনের রেইন ফরেষ্টের উপর দিয়ে এবার ঘুরে আসা যাক। এখানে একেবারে প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন ঘন বন। তবে বিভিন্ন রকম গাছের প্রাধান্য অনুযায়ী বনটি নানা টুকরায় বিভক্ত থাকার খানিকটা ভাব রয়েছে– খুব স্পষ্ট ভাবে নয়। এর মধ্যে শুধু ছোট বড় অনেক নদী স্রোতই কিছুটা যতি টেনে দিয়েছে। কোন কোন জায়গার প্লাবিত অঞ্চলটি স্পষ্ট আলাদা ভাবে রয়েছে– একটি প্রধান নদী পুরো দৃশ্যটির মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। বন কাটার ফলে মানব সৃষ্ট বিপর্যয়ও চোখে পড়ে।

রেইন ফরেষ্ট দৃশ্যপট। মাঝখানে অল্প জায়গায় বজ্রাঘাতের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়।

শেষ উদাহরণটি নেব দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে। এটি অনুচ্চ পর্বতের দৃশ্যে ভরা-এদের মাঝে মাঝে প্রশস্ত নিচু উপত্যাকা। গ্রাম, বাজার, কৃষিজমি, গোচারণভূমি, ফলের বাগান, বন সবই রয়েছে। ঝোপঝাড়, এঁদো জায়গা এসবেরও কমতি নেই। এর মধ্যে আবার ছোট আকারের বেশ প্রাচীন ধাঁচের শহর যা ওখানকার পার্বত্য ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে প্রায় মিশে যাওয়া। সব মিলে বহু টুকরায় বিভক্ত জটিল একটি দৃশ্যপট। এসবের মধ্যে মানুষের হাত সর্বত্র চোখে পড়ে। রাস্তা, পাওয়ার লাইন, নদী ইত্যাদি ঐ জটিলতার মধ্যে স্পষ্ট সরল বিভক্তি রেখাগুলো এঁকে দিয়েছে।

ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের দৃশ্যপট

যেভাবে বলা হলো প্রথম দর্শনেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই চারটি উদাহরণের দৃশ্যপটের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যগুলো খুবই প্রকট। কোন কোন দিক থেকে এই পার্থক্য তাও বেশ বুঝা যাচ্ছে। ঐ সেই উপাদানগুলোর মধ্যে বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ, মানুষের হস্তক্ষেপের পরিমাণ, প্রাকৃতিক প্রভাবে বিপর্যস্ততা, ভূমির উঁচুনিচু হবার পরিমাণ– এই সবেই পার্থক্য।

কিন্তু বহু পার্থক্য সত্ত্বেও এদের মধ্যে মৌলিক প্রকৃতি গঠনের কতগুলো সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়। এদের প্রত্যেকটির দৃশ্যপট কম বেশি নানা টুকরায় বিভক্ত– যাদের মধ্য

দিয়ে রয়েছে রাস্তা, নদী, ঝোপ সারি এমনিতরো নানা রেখা। দেখা যায় সবগুলো ক্ষেত্রে হয় প্রাকৃতিক কারণে, নয় মানুষের প্রভাবে, নয় উভয় কারণে, দৃশ্যপটগুলোর সৃষ্টি ও পরিবর্তন ঘটেছে। সব ক'টিতে জলবায়ুর সঙ্গে ভূ-প্রকৃতি খুব ঘনিষ্টভাবে পারস্পরিক প্রভাব রেখেছে। প্রাকৃতিক প্রভাবগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৃশ্যপটের উপাদানে বৈসাদৃশ্য কমিয়ে এদেরকে এক রকম করার পক্ষে কাজ করেছে, অন্য দিক মানুষের প্রভাবগুলো বেশি বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে– চাষবাসের মাধ্যমে, শহর-গ্রাম তৈরি করে, জ্বালানি ব্যবহার করে। আর একটি বড় বিষয় সব রকম দৃশ্যপটেই রয়েছে; তা হলো এগুলোর কোনটিই একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে টিকে থাকেনা– এখানে জড় ও জীব সব কিছুই কাজের মধ্যে রয়েছে। যেমন এর মধ্যে ঘটছে বস্তুর প্রবাহ (পানি, মাটি, শিলা), শক্তির প্রবাহ (সৌর শক্তি, জলশক্তি, বায়ুশক্তি, ফসিল জ্বালানির শক্তি), আর জীবের নানা প্রজাতির প্রবাহ। এই শেষেরটি অর্থাৎ উদ্ভিদ আর প্রাণির চলাচলটি দৃশ্যপটের নানা উপাদানের বিন্যাসের উপর খুবই নির্ভরশীল– যেমন সেই টুকরা আর রেখায় সৃষ্ট জটিলতার উপর। সব রকম দৃশ্যপটে আবার উল্লিখিত সব কিছুর মধ্যে একটি ভারসাম্য, একটি স্থিতিশীলতার চেষ্টা রয়েছে। এই স্থিতিশীলতা কোথাও কম বা একেবারে অনুপস্থিত, আবার কোথাও বা একাধিক ধরনের স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। এটি নির্ভর করে প্রধানত শক্তির প্রবাহ, আর বিপর্যয় ঘটার পরিমাণ বা বিপর্যয় থেকে সেরে উঠার উপযুক্ততার উপর।

কতগুলো সাধারণ নীতি

প্রকৃতিক দৃশ্যপটের জন্য যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার মধ্যে কিছু সাধারণ নীতি আমরা ধরে নিতে পারি। এসবের ভিত্তি, এবং তাৎপর্য আরো স্পষ্ট করতে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে যেতে হলেও নীতিগুলো এখনই কিছুটা বোধগম্য হবে। দৃশ্যপটের মধ্যে সবকিছু কতটা নিরবিচ্ছিন্ন বা সমসত্ত্ব ভাবে অথবা কতটা বিচ্ছিন্ন বা অসমসত্ত্ব ভাবে রয়েছে সেই বিষয়টির সঙ্গে অন্যান্য বিষয়গুলোর সম্পর্ক প্রধানত এই নীতিগুলো তুলে ধরছে। এর কিছু নীতি দৃশ্যপটের গঠনের বিষয়ে, কিছু তার কাজের বিষয়ে আর কিছু তার পরিবর্তনের বিষয়ে। এই গঠন, কাজ আর পরিবর্তন নিয়েই তো প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের এবং ইকো-সিষ্টেমের তত্ত্ব।

গঠন ও কাজের নীতি:

দৃশ্যপটের সবকিছুকে হয় টুকরার, নয় রেখার (করিডর), নয় সবকিছুর পটভূমির আকারে থাকতে হয়। আর এর মধ্যে যে ইকো-সিষ্টেমগত জিনিসগুলো রয়েছে সেই মাটির পুষ্টিদ্রব্য, শক্তি, জৈববস্তু, উদ্ভিদ, প্রাণি ইত্যাদি ঐ নানা টুকরা আর করিডরের মধ্যে বন্টিত থাকে। কীভাবে এই বন্টন হবে তা নির্ভর করে ঐ টুকরা আর করিডরের গঠন বিন্যাসের উপর। অন্যদিকে এই জিনিসগুলো দৃশ্যপটের উপাদানগুলোর মধ্যে এক জায়গায় সীমিত থাকে না, সব সময় একটি থেকে অন্যটিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই প্রবাহের উপর নির্ভর করে দৃশ্যপটের কাজ।

জীববৈচিত্রের নীতি:

দৃশ্যপট যত বেশি অসমসত্ত্ব হবে, অর্থাৎ বৈচিত্রময় হবে, এতে বড় টুকরা থাকার সুযোগ তত কমে যাবে; তখন দৃশ্যপটটি হবে ছোট ছোট টুকরা আর তাদের মধ্যে করিডর নিয়ে জটিল রূপের। সে ক্ষেত্রে সংখ্যায় স্বল্প যে প্রাণি প্রজাতিগুলো টুকরার কিনারা থেকে দূরে টুকরার অভ্যন্তরে থাকতে অভ্যস্ত সেগুলো খুব একটা থাকবেনা। কিন্তু অন্য অনেক প্রজাতি আছে যারা টুকরার কিনারায় থাকতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে, এরা পাশাপাশি নানা ইকোসিষ্টেমকে ব্যবহার করতে পারে– খাদ্য, বিচরণ, বংশবিস্তার এ সবের জন্য। কিনারায় থাকা এরকম প্রাণির বৈচিত্র অনেক বেশি বলে দৃশ্যপটের অসমসত্ত্বতা তাই জীববৈচিত্রের জন্য একরকম অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণভাবে ইকো-সিষ্টেমের বৈচিত্র জীববৈচিত্রের কারণ ঘটায়– কারণ প্রত্যেক ইকো-সিষ্টেমের নিজস্ব ধরনের জীব বিকাশের সুযোগ থাকে।

প্রজাতি প্রবাহ নীতি:

সব দৃশ্যপটে কম বেশি নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণি থাকে। দৃশ্যপটের মধ্যে এসব জীব প্রজাতিগুলো কীভাবে বন্টিত থাকে তা গুরুত্বপূর্ণ। দৃশ্যপটের গঠনের সঙ্গে প্রজাতি বন্টনের একটি দ্বিমুখি সম্পর্ক রয়েছে। দৃশ্যপটে প্রাকৃতিক বা মানুষের সৃষ্ট বিপর্যস্ত জায়গাগুলোতে (যেমন ঝড়ে বি□ □ স্ত বৃক্ষকুঞ্জ) সংবেদনশীল প্রজাতিগুলোর সংখ্যা কমে যায় বটে কিন্তু অন্য কিছু ধরনের প্রজাতি এখানে তবে

দিব্যি আশ্রয় পায়। আবার অন্যদিকে নানা প্রজাতির বংশ বৃদ্ধি, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা (যেমন বাতাসে উড়ে বীজের ছড়িয়ে পড়া) ইত্যাদির দৃশ্যপটের গঠনেও ভূমিকা রাখে; কারণ এর মাধ্যমে দৃশ্যপটের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন ঘটতে পারে, এমনকি তা সৃষ্টিও হতে পারে অথবা বিলুপ্ত হতে পারে। মোটের উপর গঠনের অসমসত্ত্বতা ওখানে প্রজাতির প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয়। এর মানে হলো দৃশ্যপট যদি তার সর্বত্র একই রকমের হয় তাহলে তার নানা অংশের মধ্যে প্রজাতির চলাচল কম হয়ে, আর যদি দৃশ্যপট নানাস্থানে নানা রকম হয় এই চলাচল বেড়ে যায়।

পুষ্টিদ্রব্যের পুনর্বন্টন নীতি:

নানা রকম খনিজ পুষ্টিদ্রব্য বাতাস, পানি অথবা প্রাণির মাধ্যমে সব সময় দৃশ্যপটে আসছে, আবার বেরিয়েও যাচ্ছে। একটি দৃশ্যপটে খুব বেশি তীব্রভাবে বিপর্যস্ত জায়গা বেশি থাকলে সেখানে পুষ্টিদ্রব্য ধরে রাখা কঠিন হয়; বরং সেখানকার পুষ্টিদ্রব্য অন্যত্র বেশি চলে যেতে পারে।

শক্তি প্রবাহ নীতি:

দৃশ্যপটের নানা অংশের মধ্যে শক্তিও প্রবাহিত হয়– বিভিন্ন বাহক যেমন পানি, বাতাস, জীব ইত্যাদির মাধ্যমেই এই শক্তি প্রবাহ ঘটে। টুকরা ও করিডরের কারণে দৃশ্যপটে অসমসত্ত্বতা যত বাড়বে তাতে ওসবের আয়তনের তুলনায় তাদের কিনারার দৈর্ঘ বৃদ্ধি পাওয়াতে এদের মধ্যে শক্তি প্রবাহের পরিমাণও বেড়ে যাবে। শক্তি প্রবাহ এসব কিনারা বা সীমান্ত রেখা দিয়েই এক টুকরা থেকে অন্য টুকরায় যায়।

দৃশ্যপট পরিবর্তন নীতি:

কোন বিপর্যয় যদি না ঘটে তা হলে দৃশ্যপট স্বাভাবিক পরিবর্তনে ক্রমে বেশি সমসত্ত্ব হয়ে উঠে। পরিমিত পরিমাণে বিপর্যয় যদি দৃশ্যপটের কোথাও কোথাও সৃষ্টি হয় তখন এটি অসমসত্ত্ব হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। আর বিপর্যয়গুলো যদি খুব বড় আকারের হয় তা হলে উভয়টিই ঘটার সুযোগ থাকে– কখনো সমসত্ত্বতা বেড়ে যায় কখনো কমে যায়।

দৃশ্যপট স্থিতিশীলতা নীতি:

একটি দৃশ্যপটকে তখনই স্থিতিশীল বলা যায় যখন এতে বিপর্যয় ঘটানো কঠিন হয়, আবার বিপর্যয় ঘটলে তার থেকে সারিয়ে তোলাও কঠিন হয়। স্থিতিশীলতা অনেকটা নির্ভর করে এতে জৈব বস্তুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর। যেখানে জৈব বস্তু প্রায় নেই বলেই চলে– যেমন মহাসড়ক অথবা বালিময় দৃশ্যপটে– সেখানে ভৌত পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে, এটি সহজে উত্তপ্ত হয়ে যেতে পারে, অথবা শীতল হয়ে যেতে পারে; কিন্তু জৈব প্রক্রিয়ার দিক থেকে এটি বেশ স্থিতিশীল থাকে। কৃষিজমির মত পরিমিত জৈব বস্তু যুক্ত দৃশ্যপটগুলোতে সহজে জৈব বিপর্যয় ঘটতে পারে, কিন্তু তার থেকে সেরে উঠাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়– কাজেই এর স্থিতিশীলতা কম। অন্যদিকে বনাঞ্চলের মত অধিক জৈব বস্তু সম্পন্ন জায়গায় সহজে বিপর্যয় ঘটানো যায়না, কিন্তু একবার বিপর্যয় ঘটলে তার থেকে সেরে উঠতে অনেক সময় লাগে– এসব দৃশ্যপট তাই বেশ স্থিতিশীল। যেমন সিডর ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বাংলাদেশের সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল– এরকম ঘটনা অহরহ ঘটেনা। কিন্তু সিডরের বিপর্যয় থেকে এর অনেক জায়গা বহু বছর পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেনি। উভয় কারণে সুন্দরবনকে খুব স্থিতিশীল একটি দৃশ্যপটই বলতে হবে।

বহুমহলা বাড়ি ও তার বাসিন্দারা

ইকোলজি

এক একটি জায়গায় যেখানে পরিবেশের বিভিন্ন জৈব আর অজৈব উপাদান পরস্পরের সঙ্গে নানা রকম বিক্রিয়া করে কিছু জীব থাকার মত আবাস তৈরি করে তাকেই বলা হয় একটি ইকো-সিস্টেম। শব্দটি আমরা ইতোমধ্যেই ব্যবহার করেছি এবং তার মানেটাও এক রকম বুঝে নিয়েছি। কৃষি এলাকার বা এরকম অন্য কয়েকটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যপট দেখার সময় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে একটি কৃষিজমি, কিংবা আইলের উপর ঝোপ সারি, কিংবা একটি বন বা একটি বাগান, একটি পুকুর বা জলা– এ সবই এক একটি ইকো-সিস্টেম যেখানে অনেক ধরনের জীব ও অনেক ধরনের পরিবেশ উপাদান একত্রে বাস করে পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও আদান-প্রদান করে টিকে থাকে, বেড়ে উঠে।

গ্রীক ভাষায় 'ওইকোস' শব্দটির মানে হলো বাড়ি। ইকো-সিস্টেমে ইকো কথাটি ওখান থেকেই এসেছে – নানা জীবের অভিন্ন আবাস বুঝাতে। পরস্পর বিক্রিয়াশীল নানা পরিবেশ-উপাদানে গড়া এই যে আবাস তার গঠন, কাজ, নানা নির্ভরশীলতা, ভাল-মন্দ ইত্যাদির গবেষণা ও তত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে– যাকে বলা হয় ইকোলজি। বাংলা করলে দাঁড়ায় আবাসের বিজ্ঞান বা বাস্তুবিদ্যা। আমরা বরং তার আন্তর্জাতিক নাম ইকোলজি শব্দটিই ব্যবহার করবো। ইকো-সিস্টেমকে বলতে পারি সেই অর্থে এক একটি আবাস বা বাড়ি। একেই আমরা বহুমহলা বাড়ি বলেছি কারণ এ আবাসের মধ্যে রয়েছে নানা জীব প্রজাতির প্রত্যেকটির জন্য নিজস্ব খোপ, যাকে একটি নিজস্ব ভূবন (নিশ্) বলাই অধিকতর সঙ্গত হবে। আসলে একটি প্রজাতি যে আলাদা একটি প্রজাতি তা তার আলাদা ভূবন থেকেই বুঝা যায়। যেমন একটি বিশাল বৃক্ষ যদি একটি ইকোসিস্টেমের অংশ হয় তা হলে তার মগডালে পাতার তৈরি শামিয়ানাটি হয়তো কোন এক উচ্চ মার্গের পাখির ভূবন, তার কাণ্ডের কোঠরের ভেতর-বাহিরটি হয়তো কাঠঠোকরা পাখির ভূবন, ডালপালা আর নিচের মাটির বেশ খানিকটা সহ পুরো কান্ডটি হয়তো কাঠবিড়ালির ভূবন। অনেক সময় পৃথক ভূবনটি

ঠিক ভৌত আবাসের অর্থে নয় একটি জীবের নিজস্ব আচার আচরণের অর্থেই পৃথক। এই সব দিক থেকে ইকো-সিষ্টেমকে একটি বহু মহলা বাড়ি হিসেবে আমরা দেখতেই পারি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পৃথক বিষয় হিসেবে ইকোলজির প্রতি বিজ্ঞানীদের আগ্রহ গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে। তখন থেকেই এর উপর প্রচুর গবেষণা হচ্ছে এবং তত্ত্বগুলো বেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পথেই রয়েছে। পরিবেশ বিনষ্টি, জীববৈচিত্রের সংকট ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা ও উদ্যোগী হবার কারণে এর প্রতি মনোযোগ ও এর প্রয়োগ চেষ্টাও বেড়ে গেছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের অন্তর্নিহিত যে বিজ্ঞান তাও কিন্তু এই ইকোলজিরই একটি আধুনিকতর রূপ। আসলে দৃশ্যপটকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার মধ্যে ইকোসিষ্টেমের বিশ্লেষণই মুখ্য ভূমিকা নেয়। এর মূল বৈজ্ঞানিক নীতিগুলো ইকো-সিষ্টেমের নীতি থেকেই উৎসারিত। ইকোলজি কীভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের আভ্যন্তরীন রহস্য উদ্ঘাটন করছে তা বুঝতে এর বিভিন্ন অংশে একটি উপাদান অন্য একটিকে কীভাবে প্রভাবান্বিত করছে তা দেখাটিই মুখ্য– যেমন জলবায়ুর দ্বারা ইকো-সিষ্টেমের বাসিন্দাদেরকে। এ ধরনের প্রায় সব ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষনীয়। একটিতে দেখা যায় যে প্রায়ই প্রভাবটি দ্বিপাক্ষিক –যার উপর প্রভাবটি ঘটে ঐ প্রভাবের খানিকটা সেও প্রথম পক্ষের উপর ফিরিয়ে দেয়, যাকে বলা যায় ফীডব্যাক। ফিরিয়ে দেয়া প্রভাবটি প্রথমটিকে আরো জোরদার করলে সেটি হবে পজিটিভ ফীডব্যাক, দুর্বল করে দিলে সেটি হবে নেগেটিভ ফীডব্যাক। অন্য যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয় তা হলো ইকোলজির ঘটনাগুলোর জন্য আমরা যখন এটি কী এবং কেমন করে কাজ করে তাই শুধু জানতে চাই তা হলে এর একটি নিকটবর্তী বা তাৎক্ষণিক কারণ নির্দিষ্ট করে খুশি থাকতে পারি। কিন্তু যখন কেন এটি ঘটে সেটি উদ্ঘাটন করতে চাই তখন আরো মূল কারণে যেতে হয়, যাকে দূরবর্তী কারণও বলা যায়। সেক্ষেত্রে একটি প্রজাতির বিবর্তনগত উৎপত্তি, অতীতের বড় জলবায়ু পরিবর্তন, অথবা শক্তি প্রবাহের মৌলিক নীতির মত মৌলিক সব বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানীকে উত্তর খুঁজতে হয়।

ভৌত পরিবেশ

জলবায়ু:

ইকো-সিষ্টেমের সর্বত্র উত্তাপ, আলো, আর্দ্রতা, বাতাস এসবের যথাযথ প্রাপ্তির উপর এখানকার যাবতীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়া অনেক খানি নির্ভর করে। ইকো-সিষ্টেমটি পৃথিবীর জলবায়ু অঞ্চলগুলোর কোনটিতে অবস্থিত সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– নিরক্ষীয় উষ্ণ অঞ্চল, মরু অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, অথবা মেরু অঞ্চল– এদের মধ্যে কোনটিতে? উত্তাপ, আলো, আর্দ্রতা, বাতাস ইত্যাদি সেভাবেই নির্ধারিত হয়ে অজৈব ও জৈব উভয় পরিবেশকে খুবই প্রভাবান্বিত করে। যেমন যত জীব একটি ইকো-সিষ্টেমের বাসিন্দা তারা সবাই তাদের খাদ্য বা দেহ-শক্তির জন্য সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে সূর্যালোকের উপর নির্ভর করে। সূর্যের যেটুকু আলো শেষ পর্যন্ত ভূমি পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারে তারও মাত্র এক শতাংশ সালোক সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হতে পারে। ইকো-সিষ্টেমে শক্তি প্রবাহে এইটুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলবায়ু অঞ্চলই নির্ধারিত করে দেয় কতখানি সূর্যালোক সেখানে পাওয়া যাবে।

জলবায়ু যে শুধু ইকো-সিষ্টেমকে প্রভাবিত করে তা নয়, ইকো-সিষ্টেমও আবার জলবায়ুকে কিছুটা পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে। সেটি ঘটে প্রধানত মাইক্রোক্লাইমেট বা ক্ষুদ্র জলবায়ুর স্তরে। বনাঞ্চলে গাছের শাখা ও পাতা বিস্তারের ভঙ্গি উপরের পাতার দ্বারা নিচের পাতা পর্যন্ত সূর্যালোক পৌঁছানোতে বাধা দিয়ে সেখানকার মাইক্রোক্লাইমেটে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এমনকি ভুট্টার ক্ষেতেও যখন ভুট্টা গাছ বেড়ে উঠে তখন সেখানে আলো, আর্দ্রতা, উষ্ণতা সব কিছু মিলে মাইক্রোক্লাইমেট অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে যেন সূর্যালোকে সালোক সংশ্লেষণে খাদ্য যুগিয়ে যেই ভুট্টার কাণ্ড, পাতা সবকিছু বাড়তে সাহায্য করলো তারই ছায়া আবার নেগেটিভ ফীডব্যাক ঘটিয়ে সেখানকার মাইক্রোক্লাইমেটে সূর্যের আলোর প্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করলো।

ভূমি:

অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্যপটের ভূমি সম্পর্কে আমাদের উৎসাহের কারণ হলো এতে মাটি তৈরির প্রক্রিয়া। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি- পানির স্রোত, বাতাসের গতি, শিলার ফাটলে পানি জমে বরফ হবার সময় আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে শিলাকে ফাটিয়ে ফেলা ইত্যাদি

গাছের পাতা ইত্যাদি তলায় মাইক্রো ক্লাইমেট সৃষ্টি করছে-

শিলাকে ক্রমে অবক্ষয়িত করার মাধ্যমে এর থেকে মাটি তৈরি করে। একবার যেখানে উদ্ভিদ ঠাঁই পেলো তার শিকড়ের কারণেও শিলা ফেটে মাটি হতে সহায়তা পায়, যার ফলে আরো উদ্ভিদ হতে পারে– এখানে একটি পজিটিভ ফীডব্যাক আমরা দেখতে পাই। আকাশে জলীয় বাষ্প কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস ওখানে জলীয় বাষ্পে দ্রবীভূত হয়ে মৃদু এসিড বৃষ্টি হিসেবে (কার্বলিক এসিড, সালফিউরিক এসিড ইত্যাদি) ভূমিতে আসে এবং শিলাকে অবক্ষয়িত করতে সাহায্য করে। এভাবে সৃষ্ট মাটির মধ্যেও লাইকেন প্রকৃতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ অথবা ব্যাকটেরিয়ার

দ্বারা আরো এসিড তৈরি হয়, এবং একই কাজ করে। এখানেও আমরা একটি পজিটিভ ফীডব্যাক পাচ্ছি।

শীতল তুন্দ্রা অঞ্চলের মাটিতে জৈব ক্রিয়া কম, মাটির উর্বর স্তর পাতলা, উদ্ভিদ যা আছে মাটি কামড়িয়ে আছে।

এভাবে জলবায়ু, উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া ও মাটির অন্যান্য প্রাণি, এবং ভূমির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো বিভিন্ন ফীডব্যাক সম্পর্কে জড়িত থাকার মাধ্যমে নানা ধরনের মাটির সৃষ্টি করে। কোথায় কী রকম উদ্ভিদ দানা বাঁধবে তা নির্ভর করে মাটির এই ধরনের উপর– যেমন শীতল তুন্দ্রা অঞ্চলের মাটিতে জৈব ক্রিয়া খুব কম বলে সেখানে উর্বর মাটির স্তর খুবই পাতলা। অন্যদিকে তৃণ ভূমিতে বেশ খানিকটা গভীর পর্যন্ত মাটি পুষ্টিদ্রব্যে সমৃদ্ধ থাকে। কিন্তু আবার নিরক্ষীয় রেইন ফরেষ্ট বা বাদল বন অঞ্চলে যথেষ্ট গভীর পর্যন্ত মাটি থাকলেও সেখানে জৈব ও পুষ্টি দ্রব্য কম থাকে কারণ তা প্রবল বৃষ্টিপাতে এবং ক্ষুদ্র প্রাণি ও ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা অবক্ষয় ক্রিয়ায় দ্রুত ওখান থেকে সরে যায়।

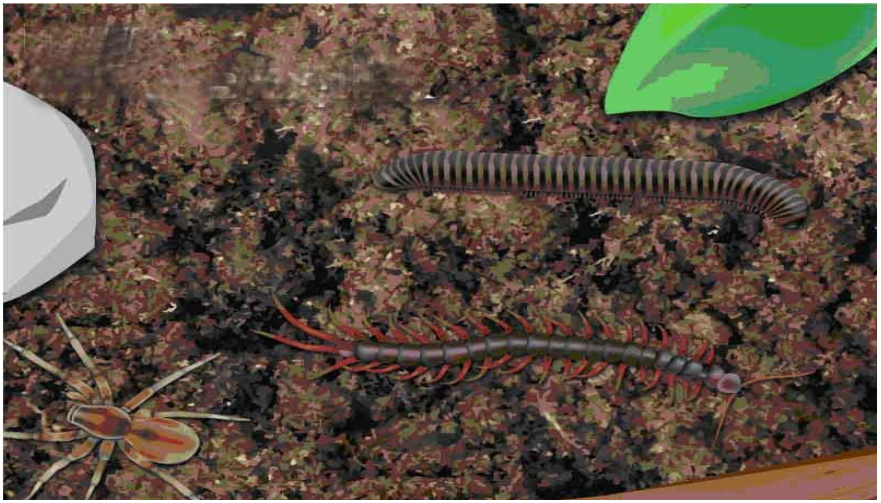

মাটিতে নানা জীব মাটির সচ্ছিদ্রতা বাড়ায়

মাটির জৈব ও খনিজ পুষ্টিদ্রব্য ছাড়া আরো ক'টি গুণাগুণ তার পক্ষে উদ্ভিদকে পোষণ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ– যেমন মাটিতে বিভিন্ন আয়তনের কণার কী রকম মিশ্রণ রয়েছে তা, এবং মাটির সছিদ্রতা। কণাগুলো পরস্পর লেগে গিয়ে কাদা তৈরি করলে যেমন সছিদ্রতা কমে, তেমনি কেঁচো জাতীয় প্রাণির প্রাচুর্য এতে খনন কাজ চালালে সছিদ্রতা বাড়ে। শিকড়ের টিকে থাকার জন্য এবং মাটির প্রাণিদের কাছে অক্সিজেন পৌঁছার জন্য এই সছিদ্রতা আবশ্যক। মাটিতে আর্দ্রতাও দরকার উদ্ভিদ ও এখানকার প্রাণির স্বার্থে। বৃষ্টির কারণে বা সেচে যে আর্দ্রতা এটি পায় তার এক অংশ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে গভীরে চলে যায়, অন্য অংশ মাটির কণার গায়ে অবিচ্ছেদ্য ভাবে লেগে থাকে। শুধু তৃতীয় অন্য এক অংশটুকুই কৈশিকতার নিয়মে (সরু নলের মধ্যে যেভাবে তরল নিজ থেকে উঠে আসে) উপরে উঠে এসে শিকড়ের ও কাণ্ডের মাধ্যমে উদ্ভিদের উপরের অংশে যায়।

পানি:

দৃশ্যপটের যাবতীয় পানির সম্পর্ক প্রকৃতির জল চক্রের সঙ্গে। এই চক্রে ভূ-পৃষ্ঠের পানি বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে গিয়ে মেঘ হচ্ছে; আর বৃষ্টি, তুষার ইত্যাদির মাধ্যমে

আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফেরৎ আসছে। এর খানিকটা নদী-নালা পুকুরে থাকছে অথবা প্রবাহিত হচ্ছে, অন্য অংশ ভূমির গভীরে চলে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানির উপরিতলের সঙ্গে অবশ্য অনেক সময় নদী, পুকুর ইত্যাদিরও আদান-প্রদান থাকছে।

সমতল জায়গার নানা বাঁকের নদী যেখানে ধীর গতির হয়ে যায় সেখানে, এবং পুকুর, হ্রদ প্রভৃতির মোটামুটি স্থির পানিতে এদের তলায় পলি জমে; এবং তাই সেখানে তলদেশের উদ্ভিদের জন্মানো সহজ হয়। তা ছাড়া সব পানিতেই থাকে ভাসমান অন্যান্য উদ্ভিদ এবং ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন। এরা সবাই সালোক সংশ্লেষণ করে জলজ প্রাণিকে খাবার যোগায়।

জলাশয়ে উপরের পানি সূর্য তাপে গরম থাকে, নিচের পানি ঠান্ডা থাকে। কিন্তু শীত প্রধান দেশে শীতের শুরুতে উপরের পানি ঠাণ্ডা ও ঘন হয়ে ডুবে গেলে এটি তখন নিচের অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা পানিকে উপরে উঠে আসতে বাধ্য করে। এ ভাবে পানি উল্টাবার ফলে অনেক পুষ্টিদ্রব্য যা তলে ডুবে গিয়েছিল তা আবার উপরে উঠে এসে ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন বৃদ্ধির সুযোগ ঘটায়। তেমনি তলায় অক্সিজেন পৌঁছতেও এটি সহায়ক হয়। কাজেই নানা ঋতুতে পানির পরিবর্তনটি বিভিন্ন দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরে, হ্রদে আর একটি বিষয় খুব চোখে পড়ে তা হলো একটি পানা জাতীয় উদ্ভিদ (আলজি) এত পুষ্টি পেয়ে যায় যে তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে পুরো জলাশয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। 'ব্লুম' নামে পরিচিত এই ঘটনা অন্য উদ্ভিদের জন্য সমস্যা ঘটায়। কিন্তু কিছু পরে হয়তো ঐ প্রথমটি মরে গিয়ে দ্বিতীয় আর এক ধরনের পানার ব্লুম ঘটে।

ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে বাঁচে পানির ক্ষুদ্র প্রাণি জু-প্ল্যাঙ্কটন। ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন বাড়লে জু-প্ল্যাঙ্কটন বাড়ে। তবে একটি নেগেটিভ ফীডব্যাকে এই বৃদ্ধি ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটনকে বেশি খেয়ে ফেলে তাকে সীমাবদ্ধ রাখে। সাগরের খাঁড়িতে সমুদ্রের নোনা পানির সঙ্গে যেখানে নদী থেকে আসা মিঠাপানির সংমিশ্রণ হয় সেখানে ঈষৎ নোনা পানির পরিবেশে জলজ জীববৈচিত্রের জন্য অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়। জোয়ারের পানির আসা যাওয়াও এতে অবদান রাখে। দেখা যায় যে যদিও পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ স্থান জোড়া সমুদ্রে নানা জলজ জীব থাকার কথা তবুও এর অধিকাংশ জায়গাকে জৈব উৎপাদনের দিক থেকে প্রায় 'মরুময়' বলা যায়। শুধু ঐ খাঁড়ি, অথবা প্রবাল দ্বীপ, অথবা ম্যাংগ্রোভ বনাঞ্চলের কাছের সমুদ্র ইত্যাদি কিছু বিশেষ অঞ্চলেই

দেখা যায় মাছ, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক সহ জীববৈচিত্রের ও জৈব উৎপাদনের বিরাট সমারোহ– তার বিভিন্ন পারিবেশিক সুবিধার কারণে।

আগুণ:

প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে যেসব ভৌত পরিবেশের বিশেষ প্রভাব রয়েছে তার মধ্যে আগুণও একটি। বেশ কিছু পারিবেশিক অঞ্চল রয়েছে যেখানে দাবানলের ফলে বা মানুষের দেয়া আগুণে (যেমন জুম চাষে) উদ্ভিদ ও প্রাণির যথেষ্ট সুবিধা হয়ে যায়– এরা ঘন ঘন আগুণের উপর যেন বেশ খানিকটা নির্ভর করার মত হয়েই গড়ে উঠে। এদের আচরণগুলোর মধ্যে রয়েছে মাটির গভীরে গর্ত করা, অঙ্কুরোদগম করা, পাইন গাছের মত গাছে বংশ বৃদ্ধির জন্য 'কোন' নামক যে ফুল-সদৃশ অংশ থাকে তার উন্মোচন ঘটা ইত্যাদি যা শুধু উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেই তারা করে থাকে। আবার অন্য দিকে যেখানে সচরাচর আগুণের ঘটনা ঘটেনা, সেখানে কখনো আগুণ সৃষ্টি হলে তাকে ওখানকার জীবজগৎ একটি ভয়ানক বিপর্যয় হিসেবে দেখে – ওখানকার দৃশ্যপটে তার নেতিবাচক প্রভাবগুলোই ফুটে উঠে।
আগুণ আর উদ্ভিদের ফীডব্যাক সম্পর্কটিও লক্ষ্যণীয়। আগুণ উদ্ভিদকে পুড়ে ফেলে, কিন্তু উদ্ভিদই আবার আগুণকে উস্কে দেয়, বাড়িয়ে তোলে।

জীব-সংখ্যার উত্থান-পতন

ইকো-সিষ্টেমে জীববৈচিত্র হলো প্রজাতির বৈচিত্র, কত বেশি রকমের প্রজাতির সেখানে আছে তা। আর একই প্রজাতির কতগুলো জীব সেখানে আছে তা হলো ঐ প্রজাতির পপ্যুলেশন যাকে আমরা বলতে পারি জীব-সংখ্যা। যদি স্থান, খাদ্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদানের কোন সীমাবদ্ধতা না থাকতো তা হলে জীব-সংখ্যা অতি দ্রুত প্রায় অসীম ভাবে বৃদ্ধি পেতো। গণিতে যাকে বলা হয় গুণোত্তর হার সেভাবে বৃদ্ধির হার ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর হতো। শুরুতে আসলেও বৃদ্ধি সে হারেই ঘটে– কারণ প্রথমে কয়েকটি বংশধর থেকে পরের প্রজন্মে কয়েক গুণ বেশি, এর পরের প্রজন্মে আরো বহুগুণ বেশি– এমনি ভাবে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু প্রত্যেকটি পরিবেশের বিশেষ জীবের ভার বইবার একটি উর্দ্ধ সীমা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাই ঐ বৃদ্ধির হার

স্তিমিত হয়ে আসে, এবং এক পর্যায়ে গিয়ে আর একেবারেই বাড়েনা। পরে এক পর্যায়ে গিয়ে জীব-সংখ্যা কমতেও শুরু করতে পারে।

জীব-সংখ্যার উত্থান-পতন কী রকম হতে পারে এজন্য বেশ কিছু গাণিতিক মডেলিং করা হয়েছে এর উপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাবকে গণিতের হিসেবের মধ্যে এনে। স্থান বা খাদ্যের মতো কোন সীমিত সম্পদে ভাগ বসাবার জন্য যখন দুটা প্রজাতি বা একই প্রজাতির নানা সদস্য প্রতিযোগিতা করে সেই বিষয়টি ও মডেলে অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে দুটি পরিস্থিতি হতে পারে। উভয় প্রতিযোগী যদি এই প্রতিযোগিতার ফলে সমান ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা হলে উভয়েই হয় ঐ ইকো-সিষ্টেম থেকে বিলুপ্ত হবে, অথবা উভয়েই এক রকম সহ-অবস্থান করার মত অবস্থায় এসে স্থিতি পাবে। অন্যদিকে প্রতিযোগীদের একটি যদি প্রতিযোগিতা থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে সেটিই সময়ের সাথে ঐ ইকো-সিষ্টেম থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে অন্যটিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। এই তত্ত্বটি গাউসের তত্ত্ব বলে পরিচিত।

শিকার-শিকারি প্রতিযোগিতাটিও বেশ লক্ষ্যনীয়। শিকার যদি বেড়ে যায় (যেমন হরিণ), তাহলে শিকারির সংখ্যাও বাড়বে (যেমন বাঘ)– অধিক খাদ্য প্রাপ্তির ফলে। কিন্তু সেটি আবার নেগেটিভ ফীডব্যাক সৃষ্টি করে শিকারের সংখ্যা কমিয়ে ফেলবে। শিগ্‌গির এর প্রভাব শিকারির সংখ্যার উপর ও পড়বে, তাদের সংখ্যা কমে যাবে। এভাবে একে অন্যকে অনুসরণ করে উভয়ে বাড়তে ও কমতে থাকবে ক্রমান্বয়ে। অনুরূপ চক্রাকারে হ্রাস বৃদ্ধির গাণিতিক মডেল খাড়া করা হয়েছে যা মোটামুটি বাস্তব পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিতও হয়েছে।

তবে বাস্তব ক্ষেত্রে শিকারিকে একেবারে যান্ত্রিক ভাবে শিকার করার কাজ করতে দেখা যায়না, বরং এই ব্যাপারে এদেরকে 'সর্বোত্তম শিকারের' কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়– যা সব সময় নিজেদের আয়-ব্যয়ের সঙ্গতি রক্ষা করে চলে। আয়টি হচ্ছে শিকার খুঁজে পাওয়া আর ব্যয়টি হলো এর জন্য কষ্ট, ঝুঁকি ইত্যাদিকে সহ্য করে নেয়া। যেমন পছন্দের শিকার যেখানে বড় বড় ঝাঁকে থাকে সহজ শিকার করতে সেখানে যাওয়াটাই উত্তম। সে অবস্থার অবসান ঘটলে অপেক্ষাকৃত কম বড় ঝাঁকে বা এমনকি তুলনামূলক ভাবে অপছন্দের শিকারের দিকেও যেতে হয়। এই কৌশলগুলোর অনেকগুলো শিকারিদেরকে ঠেকে ঠেকে শিখতেও হয়।

আগেই দেখেছি পরিবেশের সীমাবদ্ধতার কারণে কোন জীব-সংখ্যা অসীমভাবে বাড়তে পারেনা। পরিবেশ জীব-সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের নিয়ামকগুলোর মধ্যে যেমন খাদ্য, আশ্রয়, আবহাওয়া, অসুখ, শিকারি ইত্যাদি বাইরের বিষয় থাকে, তেমনি নিজেদের আচরণ, শারীরবৃত্ত, ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ বিষয়ও থাকে। এসব নিয়ামকের মধ্যে অনেকগুলোই জীব-ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, যেমন খাদ্য, আশ্রয়, আচরণ। এর মানে একক পরিমাণ জায়গায় জীব-সংখ্যার (জীব-ঘনত্ব) উপর এগুলো নির্ভর করে। যেমন জীবন-ঘনত্ব বেশি হলে খাদ্যে টান পড়ে। অন্যদিকে আবহাওয়ার মত কিছু নিয়ামক জীব-ঘনত্ব নির্বিশেষে কার্যকর হয়। জীবের নিজস্ব আভ্যন্তরীন নিয়ামকগুলো গবেষণার দিক থেকে বেশি চমকপ্রদ। ঘনত্বের সঙ্গে এগুলোর পরিবর্তন নানা ভাবে ঘটতে পারে– যেমন ঐ এলাকা ছেড়ে জীবের নানাদিকে ছড়িয়ে পড়া, অথবা স্ত্রী জাতীয়ের মধ্যে ডিম্ব প্রস্ফুটিত কম হওয়া (কোন কোন স্তন্যপায়ী ও পাখির ক্ষেত্রে যেমন হয়) ইত্যাদি যা ঘনত্বের সঙ্গে কমে এবং জীব-সংখ্যা কমায়। এভাবে জীব-সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে। তবে দুটি সামাজিক আচরণের বিষয় আরো বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মুরগি, বানর ইত্যাদি অনেক প্রাণির সমাজে কিছু সদস্য বিশেষভাবে অগ্রগণ্য হয়ে মোড়লিপনা পায়, অন্যরা অবদমিত স্থান মেনে নেয়। প্রথমোক্তরাই অধিক খাদ্য, বংশ বৃদ্ধি ইত্যাদি সুযোগ লাভ করে, বাকিরা তা লাভ করে না তাই সংখ্যায় কমে যায়। এটি সামাজিক 'অগ্রগণ্যতার শ্রেণী বিভাজন' রীতি হিসেবে পরিচিত। তেমনি আরো একটি আচরণ রীতি জীব-সংখাকে সীমাবদ্ধ রাখে– তা হলো 'এলাকা সংরক্ষণ' রীতি। এটিও অনেক স্তন্যপায়ী ও পাখির ক্ষেত্রে দেখা যায়। এতে কয়েকটি সদস্য বা দল একটি এলাকাকে নিজের বলে চিহ্নিত করে নানা ভাবে তার ঘোষণা দেয়, এবং অন্য সদস্যদেরকে এর মধ্যে আসতে না দেবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এতেও এক একটি এলাকায় জীব-সংখ্যা সীমিত হয়ে যায়।

বিবর্তন, প্রজাতি, ও পালাবদল

আমরা একটি জীবের জীব-সংখ্যার উত্থান-পতনের বিষয়টি দেখছিলাম। কিন্তু একটি ইকো-সিষ্টেমে একটি জীব থাকেনা, এখানে ঘটে বহু জীবের সমাবেশ– নানা প্রজাতির জীবের একটি সার্বিক সমাজ এখানে গড়ে উঠে। এরকম সমাজে জীববৈচিত্রের বিষয়টি যে কোন ইকো-সিষ্টেমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ– এ সব জীব কী ভাবে প্রতিযোগিতা-

সহযোগিতার মাধ্যমে এ সমাজ একটি ভারসাম্যের মধ্যে থাকে। প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের অভ্যন্তরে আমাদের কৌতুহলের একটি বড় অংশই হয় এই জীববৈচিত্র ও এই ভারসাম্যকে নিয়ে; এবং এই ভারসাম্যের মধ্যে বিঘ্ন ঘটাকে নিয়ে।

ইকো-সিষ্টেমে নানা প্রজাতির জীবের যে সমাবেশ ঘটে তারা সবাই কিন্তু বিবর্তনের সৃষ্টি। জীব মাত্রই দীর্ঘ কালের বিবর্তনের ফসল; আর বিবর্তনের প্রক্রিয়া সব সময় চলছে। একই প্রজাতির ঐ যে জীব-সংখ্যা তার সব সদস্য কিন্তু হুবহু এক রকম নয়, একই স্থানে তাদের এই দলটির মধ্যেই রয়েছে নানা বৈচিত্র - এক এক বৈশিষ্টের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যখন ইকো-সিষ্টেমের পরিবেশে বড় রকমের কোন পরিবর্তন দেখা দেয়, তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতি দলটির সকল সদস্য সমান ভাবে সামাল দিতে পারেনা। ঐ বৈষম্য ঘটে তাদের কোন কোন বিশেষ বৈশিষ্টের ভিন্নতার কারণে– দেহের বৈশিষ্ট অথবা আচরণের বৈশিষ্ট। পরিবর্তিত পরিস্থিতে হয়তো এ বৈশিষ্টের কোন এক বিশেষ রূপ টিকে থাকার ক্ষেত্রে এবং অধিক বংশ বিস্তারের ক্ষেত্রে কিছু বেশি সুবিধা পেয়ে যায়। এর ফলে ঐ দলের মধ্যে এই রূপটির অধিকারী সদস্যরাই কিছুটা অধিক সংখ্যার টিকে থাকে ও বংশ বিস্তার করে। যদি ঐ বৈশিষ্টটি জেনেটিক অর্থাৎ বংশগত বৈশিষ্ট হয় যা সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে– তাহলে প্রজন্মের পর যত প্রজন্ম আসবে ঐ বৈশিষ্টের ঐ সুবিধা পাওয়া রূপটিই আরো বেশি বেশি সদস্যদের মধ্যে দেখা যাবে এবং প্রকটতর হবে, সুবিধা না পাওয়া রূপগুলো ক্রমে কমে যাবে, এমন কি লোপ পাবে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীব-বিবর্তন। ঐ যে পরিবেশ বা পরিস্থিতির কারণে বৈশিষ্টের একটি রূপ সম্পন্ন সদস্যরা সুবিধা পেল, টিকে থাকলো ও বংশ বিস্তার করলো, সেটিই প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হওয়া। বিষয়টি একেবারেই অন্ধভাবে তাৎক্ষণিক প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে, জীবের নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা কোন সুদূর লক্ষ্য নিয়ে এটি ঘটেনা, কোন উন্নয়নের লক্ষ্যেও নয়। আর ঐ যে সুবিধা পাওয়া সেটি হলো নিজেকে খাপ খাওয়াবার সুবিধা– পরিবেশের চাপে খাপ খাওয়াবার। এভাবে একটি প্রজাতিতে খুবই ধীরে ধীরে বহু প্রজন্মের ভেতর দিয়ে একটু একটু করে– দৈহিক ও আচরণগত পরিবর্তন আসে। এমনকি প্রজাতির অনেক দল বা গোষ্ঠি অপরিবর্তিত থেকে গেলেও একটি গোষ্ঠি শেষ পর্যন্ত নানা বৈশিষ্টের দিক থেকে এতই পরিবর্তিত হয়ে যায় যে মূল প্রজাতির সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য থাকেনা, দুই দলের পুরুষ ও স্ত্রী সদস্যরা আর পরস্পরের সঙ্গে প্রজননও

করতেও পারেনা। ফলশ্রুতিতে শেষোক্ত দলটি একটি নূতন প্রজাতিই হয়ে পড়ে। এভাবেই বিবর্তনের ফলে নূতন নূতন প্রজাতি সৃষ্টি হয়।

নূতন প্রজাতির সৃষ্টিটি ত্বরান্বিত হয় যখন বৈশিষ্টের পরিবর্তনটি দেখা দেয়া দলটি যদি মূল দল থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে– যেমন কোন প্রাকৃতিক বাধার দ্বারা, কোন আলাদা দ্বীপে বা দুর্গম জায়গায়; অথবা আচরণগত ভাবেও তাদের মধ্যে মেলা মেশায় বড় বাধা দেখা দেয়াতে। তখন উভয়ের মধ্যে প্রজননগত সম্পর্কের সুযোগ না থাকায় পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে উভয়ের জিন মিশ্রণ ঘটতে পারেনা, এবং যেভাবে বৈশিষ্টের বিচ্ছিন্নতা কমে যাওয়ার সুযোগ ঘটেনা। বৈশিষ্টটির দিক থেকে তারা আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দূরের প্রজন্মগুলোতে গিয়ে কখনো যদি ঐ বাধা দূরও হয় তখন তারা কিন্তু আর পরস্পরের সঙ্গে প্রজননক্ষম থাকেনা। তারা তখন দুটি আলাদা প্রজাতি।

বিবর্তনের ফলে ঘটা পরিবর্তনগুলো হয়তো অল্পসময়ের ব্যবধানে স্পষ্ট হয়না, কিন্তু বিবর্তনগত খাপ খাওয়ার চাপ কিন্তু সব জীবের উপর সব সময় কাজ করে যাচ্ছে। একটি ইকো-সিষ্টেমের নানা প্রজাতির হ্রাস বৃদ্ধি উপর তার প্রভাব রয়েছে। তা ছাড়া একক ভাবে বা গোষ্ঠিগত ভাবে প্রজাতির আচরণ ব্যাখ্যা করতে গেলেও এর শরণাপন্ন হতে হয়। খাপ-খাওয়ার চাপে সাড়া দিতে গিয়েই অধিকাংশ আচরণের সৃষ্টি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

ইকো-সিষ্টেমের মধ্যে এক একটি প্রজাতি তার নিজের মত করে একটি পারিবেশিক ভূবন তৈরি করে, এই ভূবনের সব কিছু এই প্রজাতিই ব্যবহার করে– সেটি স্থান, খাদ্য ইত্যাদি সম্পদ বা নিজস্ব কিছু আচরণগত বাতাবরণ ইত্যাদি; অন্য কোন প্রজাতি তাতে ভাগ বসাতে পারে না। এ যেন যেই বহু মহলা বাড়ির কথা আমরা বলছি, তার এক একটি আলাদা মহল, যাতে শুধু একটি প্রজাতিরই সঙ্কুলান হয়। সাধারণত তাই একটি ইকো-সিষ্টেমে যত বেশি এরকম পৃথক ভূবন থাকবে তাতে প্রজাতির বৈচিত্র বেশি থাকবে, অন্যদিকে ইকো-সিষ্টেম যত একঘেয়ে একই রকম হবে, ভূবন কম থাকবে, প্রজাতির বৈচিত্রও কম হবে। একটি বনভূমিতে গাছের মগডাল থেকে শুরু করে তলার মাটির গর্ত পর্যন্ত কত পাখি, কত স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পোকা মাকড়ের ভূবন রয়েছে যার যার নিজস্ব ভূবন, তার ইয়ত্তা নেই। আবার একটি কৃষিক্ষেতে কিন্তু

ভূবন বৈচিত্র খুবই কম, প্রজাতি বৈচিত্রও তাই কম। তবে কিছু কিছু প্রজাতি আছে যাদের ভূবনগুলো কিছু 'প্রশস্ত' অর্থাৎ নানা রকম রসদ ব্যবহারের সুযোগ তাদের আছে। সে রকম প্রজাতির ভাবসাব হয়ে অনেকটা সাধারণ গোছের (জেনারেলিষ্ট) এবং এমন প্রজাতিগুলোর মধ্যে প্রায়শ একই রসদ নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগে থাকে। অন্যদিকে যাদের ভূবনগুলো খুব সরু, সুনির্দিষ্ট, তারা প্রত্যেকে বিশেষ ধরনের (স্পেশিয়ালিষ্ট)। এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কম বলে ইকো-সিষ্টেমের জীব সমাজে প্রজাতির সংখ্যা অর্থাৎ জীববৈচিত্র সেক্ষেত্রে বেশি হতে পারে। আমাদের শহরে কাকের যে ভূবন তাকে বেশ প্রশস্ত বলা যায়, আবার চীনের বাঁশবনে পাণ্ডার যে ভূবন তা খুবই সরু, পাণ্ডা বাঁশপাতা ছাড়া কিছু খায়না।

আমরা দৃশ্যপটে বহু মহলা বাড়ির বাসিন্দাদের বৈচিত্র যেমন দেখছি, তেমনি সময় সময় এ বাড়ির বাসিন্দাদের এক দল চলে গিয়ে বাইরে থেকে আরেক দলকে আসতে দেখা যায় । দৃশ্যপটে যখন কোথাও বিপর্যয় ঘটে তখন সেখানে খালি জায়গার সৃষ্টি হতে পারে, নূতন উদ্ভিদ বা প্রাণি প্রজাতি ওখানে এসে বসত নিতে পারে। বলা যায় ওরাই খালি জায়গাটিকে প্রথম বসতের পত্তন করলো। তারপর সময়ের প্রবাহের সঙ্গে

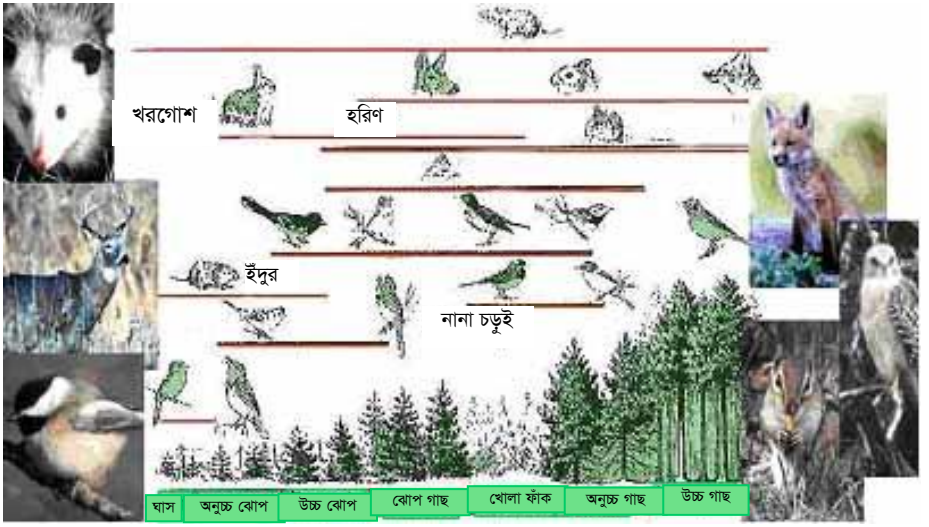

দৃশ্যপটে উদ্ভিদ ও প্রাণির পালা বদল

এক প্রজাতি গিয়ে অন্য প্রজাতি আসে, এভাবে কয়েকবার বদলের পর এখানকার জীব সমাজে এমন কিছু প্রজাতি প্রাধান্য লাভ করে যারা বেশ স্থায়ী ভাবে ওখানে বেঁচেবর্তে থাকে এবং নির্বিঘ্নে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। এমন জীব সমাজকে বলা হবে তুঙ্গে ওঠা সমাজ (ক্লাইম্যাক্স কম্যুনিটি); আর এভাবে বদল হতে হতে শেষ পর্যন্ত ক্লাইম্যাক্স লাভ করার পুরো বিষয়টিকে বলা হয় পর পর পালা বদল (সাকসেশন)।

মনে করা যাক বনের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে কোন কোন জায়গার গাছগুলো মরে গেছে কোন এক বিপর্যয়ে। ফলে এক টানা বনে এসব জায়গায় কতগুলো ফাঁকের (গ্যাপ) সৃষ্টি

ঘন বনের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ফাঁক: পালাবদল এখান থেকে শুরু হতে পারে

হলো। বহু দিন ধরে যদি এই ফাঁকগুলোকে আমরা পর্যবেক্ষণ করে যাই তা হলে পালা বদলের ঘটনাগুলো চোখে পড়বে। খুব সম্ভব দেখা যাবে শুরুতে গুল্ম জাতীয় নরম উদ্ভিদ এখানে প্রথম পত্তন নিয়েছে। এর পর অপেক্ষাকৃত ছোট কাষ্ঠময় উদ্ভিদ এসে ঐ গুল্মের জায়গা নেবে। সব শেষে বড় বৃক্ষ তাদের জায়গা নেবে। এখানকার পরিবেশের সবচেয়ে সুবিধাজনক বৃক্ষই ক্লাইমেক্স প্রজাতি হিসেবে স্থায়ী ভাবে জেঁকে বসবে– যতদিন পর্যন্ত না আর একটি বিপর্যয়ে আবার জায়গাটি ফাঁকা না হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে আবার নূতন করে পালা বদলের পালা শুরু হবে। ক্লাইম্যাক্স প্রজাতি বৃক্ষ হলে পালা

বদলের ঐ নূতন চক্র আসতে হয়তো অনেকদিন লেগে যাবে। কিন্তু তুন্দ্রা, জলা ইত্যাদির অঞ্চলের গুল্ম বা নরম উদ্ভিদের ক্লাইমেক্সে, বা তৃণ ভূমিতে কোন তৃণের ক্লাইমেক্সে, এরকম পালা বদলের সব পর্যায়ই প্রায় সমান ও স্বল্পস্থায়ী হয়, চক্রাকারে পালাবদল অল্প সময়েই আবার ফিরে আসে। প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের দিকে যখন আমরা তাকাই তখন আমরা সাধারণত ক্লাইমেক্স প্রজাতিতে গড়া জীব সমাজ দেখতে পাই যেমন আগাগোড়া শালবন, বা পাইনের বন, বা বিশেষ ঘাসের তৃণ ভূমি, এবং এসবের প্রাণিকূল ইত্যাদি। এর মাঝে মাঝে অবশ্য থাকতে পারে এখানে ওখানে টুকরা টুকরা স্থানে অন্য রকম জীব সমাজ অনেকটা মোজাইকের মত দৃশ্যপটের এখানে ওসব টুকরায় রয়ে গেছে ক্লাইম্যাক্স পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোর অবশিষ্ট প্রজাতিগুলো।

ইকো-সিষ্টেমের রসদঃ শক্তি ও বস্তুর প্রবাহ

ইকোসিষ্টেমের মধ্য দিয়ে শক্তির প্রবাহ একে সচল রাখে। এর নানা অংশের মধ্য দিয়ে এই প্রবাহই এখানকার জীব সমাজের বড় বন্ধন ও নিয়ামক। শক্তি আসে মূলত সূর্য থেকে। এরই অল্প কিছু সবুজ উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষেণে একে নিজের দেহের অবয়বে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা করে। শ্বসন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ এ শক্তির একটি অংশ সরাসরি বায়ুমণ্ডলে ফেরৎ দেয়। যদি কোন উদ্ভিদভোজি প্রাণি এই উদ্ভিদ খায় তা হলে সেটি তার কাছে যায়; তার কাছ থেকে প্রাণিভোজি অন্য প্রাণির কাছে যেতে পারে, তারপর ক্রমাগত খাদ্য চেইনে এক প্রাণি অন্য প্রাণিকে খেয়ে চারণ-নির্ভর খাদ্য চেইনটি সম্পূর্ণ করে। আদিতে চারণ ভূমিতে তৃণভোজিদের মাধ্যমে শুরু হয় বলেই এটি চারণ-নির্ভর। কিন্তু এর বাইরেও শক্তির তৃতীয় আর একটি অংশ আছে– যা মৃত জীবের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। মৃতভোজি প্রাণিরা তাই অন্য আর একটি খাদ্য চেইনের সৃষ্টি করে কোন কোন প্রাণি মৃতভোজিদের খেয়ে এবং তাদেরকে আরো অন্য প্রাণিরা খেয়ে। এই চেইনটিকে বলা হয় মৃত-নির্ভর খাদ্য চেইন। এই সবগুলো চেইনে প্রাণিরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত শক্তিকে বায়ুমণ্ডলে ফেরৎ দেয়– তাপ হিসেবে। এই ফেরৎ দেয়া তাপ কিন্তু আর সালোক সংশ্লেষণের কাজে লাগেনা– তাই কোন চেইনের মাধ্যমে ইকো-সিষ্টেমে ফেরৎ আসতে পারেনা। কাজেই একবার সূর্য থেকে আসার পর ইকোসিষ্টেমের শক্তি প্রবাহ একমুখি।

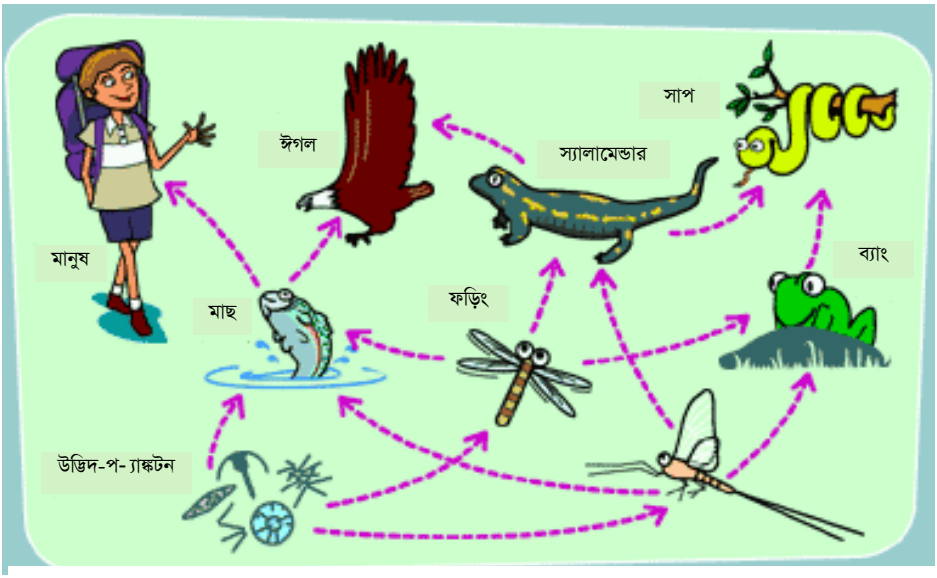

খাদ্যের নানা চেইন খাদ্য-জালিকা তৈরি করে

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে খাদ্য চেইনে একেবারে গোড়াতে প্রাথমিক সালোক সংশ্লেষণকারী উদ্ভিদ থেকে শুরু করে একদম শীর্ষ খাদক (যে আর কোন প্রাণির পেটে যায়না) প্রাণিটি পর্যন্ত পর পর অনেকগুলো ধাপে একটি শক্তি পিরামিড গঠিত হয়। প্রত্যেকটি ধাপে শক্তির কিছু ক্ষয় হয়, তাই নিচের ধাপের সব শক্তি পূর্ণ দক্ষতায় পরবর্তী উপরের ধাপে গিয়ে পৌঁছেনা। আমরা যে শক্তি এবং বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে তার প্রবাহিত হবার যে দক্ষতার কথা বলছি পরিমাপ পাওয়া যাবে প্রত্যেক ধাপে মোট জৈব বস্তুর (বায়োম্যাস) পরিমাণ থেকে। সালোক সংশ্লেষণকারী সবুজ উদ্ভিদের দেহ সৃষ্টির মাধ্যমেই এই জৈব বস্তুর উৎপাদন শুরু হয়– তাই সেটিই প্রাথমিক উৎপাদন। এই উৎপাদনই বাকি সব ধাপে মোট জৈব বস্তুর উৎস– প্রত্যেক ধাপে অবশ্য এর পরিমাণ ক্রমে কমে যাবে। কাজেই প্রাথমিক উৎপাদনে মোট জৈব বস্তুর (এরকম সব উদ্ভিদের) ভরই হলো শুরুতে শক্তির পরিমাণ। যে রকম দৃশ্যপটের মধ্যে প্রাথমিক উৎপাদনের সুযোগ বেশি থাকবে– যেমন স্থলে রেইন ফরেষ্টে (বাদল বন) অথবা সমুদ্রে খাঁড়ি কিংবা প্রবাল দ্বীপে– সেখানে বাকি ধাপগুলোও শক্তিতে সমৃদ্ধ

হবে। সেখানকার জীববৈচিত্র অন্যান্য দৃশ্যপটের চেয়ে অনেক বেশি হবে– যেমন মরুভূমির চেয়ে বা খোলা সমুদ্র থেকে। একটি একক আয়তনে কত ভরের প্রাথমিক উৎপাদন হবে সেটিই এরকম এক একটি ইকো-সিস্টেমের উৎপাদনশীলতার পরিমাপ।

আমরা শক্তির পিরামিডকে দেখলাম খাদ্য চেইনের ভিত্তিতে। কিন্তু কোন ধাপের একটি প্রাণি খাদ্যের জন্য তার নিচের ধাপের শুধু একরকম প্রাণির উপর নির্ভর করেনা, তার খাদক-খাদ্যের সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু প্রজাতির সঙ্গে। কাজেই এখানে খাদ্য চেইনের প্রশ্ন নয়, বরং যা রয়েছে তা হলো খাদ্য জালের প্রশ্ন। এই জালের সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটি ইকোসিস্টেমকে বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ।

শক্তি পিরামিড। এতে চারটি স্ড়র দেখানো হয়েছে, যাতে জৈববস্তুর একই একক ব্যবহার করে প্রতি স্তরে তার পরিমাণ দেখানো হয়েছে। দেখা যায় প্রত্যেকবার উচ্চতর স্তরে যাওয়ার সময় মাত্র ১০% শক্তি যেতে পারেছে।

যেমন একটি প্রশ্ন হলো কোন ধাপের একটি প্রজাতির ভূবনটি কতটা প্রশস্ত (প্রজাতিটি কত সাধারণ) অথবা কতটা সরু (প্রজাতিটি কত বিশেষ); অর্থাৎ জালের কতগুলো সংযোগ দিয়ে এটি পরবর্তী নিচের ধাপের প্রজাতিগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত? আরেকটি প্রশ্ন হলো জালের মধ্যে কোন পথ দিয়ে শক্তির প্রধান প্রবাহটি ঘটছে? এটি জানলে আমরা

অর্থনৈতিকভাবে উপকৃতও হতে পারি। আমরা যদি নিজেদের স্বার্থে কোন প্রজাতিকে আহরণ করতে চাই (যেমন বিশেষ কোন মাছকে) তা হলে দেখতে হবে খাদ্য জালের মধ্যে সেই প্রজাতির দিকে কীভাবে অধিক শক্তিকে প্রবাহিত করতে পারি। কারণ তা হলে এই প্রজাতির মোট জৈব বস্তু বাড়িয়ে আমরা লাভবান হতে পারবো। এমন আরো বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন উঠতে পারে।

ইকো-সিষ্টেমে বস্তুর প্রবাহের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। শক্তি প্রবাহের সঙ্গে এর একটি পার্থক্য হলো এক্ষেত্রে প্রবাহটি একমুখি নয়। যেমন খনিজ পুষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু ইকো-সিষ্টেমের মধ্যেই এখান থেকে ওখানে যেতে পারে, রূপান্তরিত হতে পারে; কিন্তু তারপরও চক্রাকারে আবার ফিরে আসে। অবশ্য এটি ইকো-সিষ্টেমের বাইরেও চলে যেতে পারে; আবার সে রকম বাইরে থেকে ইকো-সিষ্টেমের ভেতরেও আসতে পারে। প্রকৃতিতে আমরা জল চক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র ইত্যাদির কথা জানি। এর প্রত্যেকটিতে বস্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, অন্য অবস্থায় যায়, জীবের দেহে থাকে, তার বাইরে কখনো মাটিতে বা বাতাসে থাকে, কিন্তু আবার চক্রাকারে আগের অবস্থায় ফেরৎ আসে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের অভ্যন্তরের ঘটনাবলী বুঝার জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে এক নজরে আধুনিক ইকোলজির কয়েকটি মূল বিষয় দেখে নিলাম, কারণ দৃশ্যপটের অনেক কিছুর ব্যাখ্যা এদের মাধ্যমেই করতে হবে। ঘুরে ফিরে আমাদেরকে আসতে হবে কী ভাবে এতে জীব সমাজের সদস্যরা পরিবেশের সাথে আন্তক্রিয়া করছে; আবহাওয়া, ভূমি, পানি এরা কী ভাবে জীব সমাজ গঠনে প্রভাব রাখছে, ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তন প্রক্রিয়া কীভাবে আজকের প্রজাতিগুলো সৃষ্টি করেছে; ইকোসিষ্টেমের তাদের ভূবন তৈরি হয়ে কী ভাবে জীববৈচিত্রের সহায়ক হয়েছে; প্রজাতির পালাবদল কীভাবে দৃশ্যপট বদলাচ্ছে, সর্বোপরি এর মধ্য দিয়ে শক্তি প্রবাহ কীভাবে এতে জীব জগতের বিন্যাস ও পরস্পর সম্পর্ক গড়ে দিয়েছে। এখানে এসবকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা খুব বেশি উদাহারণ ব্যবহার করিনি। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সে সব উদাহরণ যথেষ্ট খুঁজে পাব।

প্রকৃতির নক্সী কাঁথা

পটভূমি, টুকরা, আর করিডর মিলে নক্সী কাঁথা

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি দৃশ্যপট কী ভাবে নানা টুকরায় গঠিত আর এগুলোর সঙ্গে রয়েছে সরু নানা রকম করিডর। যে কথাটি তখন স্পষ্ট হয়নি তা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই টুকরাগুলোর মধ্যে ব্যবধান থাকে– আর এগুলো যেন স্থাপিত থাকে একটি সাধারণ পটভূমির (ম্যাট্রিক্স) উপর; একটি চিত্রকর্ম যেভাবে ক্যানভাসের পটভূমির উপর অঙ্কিত হয়। করিডরগুলোই নানা টুকরার মধ্যে সংযোগের কাজ করে। দৃশ্যপট যদি একটি নক্সী কাঁথা হয় তা হলে এই পটভূমি হলো তার বিস্তৃত জমিন যার উপর টুকরার তালিগুলো ছড়িয়ে আছে আর এদের মাঝে করিডরের সরু পথরেখাগুলো নক্সাটিকে একটি জালিকার রূপ দিচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইয়ে বালি হাসের পিঠে চড়ে উপর থেকে বুড়ো আংলার কাছে যে রকম টুকরা টুকরা চাষের ক্ষেতের মাঝে মাঝে খালবিল নদী নালাগুলো নিয়ে বাংলাদেশের দৃশ্যপটকে মনে হয়েছিল অফুরন্ত দাবার ছকের মতো– সেই টুকরা আর সেই নদী নালার করিডর।

বিমান থেকে তোলা ছবি: দৃশ্যপটের নক্সী কাঁথা

টুকরা আর করিডরের ধারণাটি আগেই পেয়েছি, কিন্তু এক্ষেত্রে পটভূমিটি কী? যদি একই রকম চারিদিক বিস্তৃত কোন দৃশ্যপট-উপাদানের মধ্যে টুকরাগুলো দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকে তা হলে পটভূমিকে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয়না– যেমন মরুভূমির মধ্যে এখানে ওখানে মরুদ্যান, সেখানে মরুভূমিটিই পটভূমি। বহুকাল আগে জায়গাটি যখন মরুময় ছিলনা, ছিল সমৃদ্ধ কৃষি ক্ষেত্র তখন হয়তো একটানা চাষের জমিই ছিল পটভূমি তার মাঝে মধ্যে হয়তো ছিল অনাবাদী মরুময় কিছু ভিন্ন রকম টুকরা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে এই চিত্রটি একটি চরম রূপ– সাধারণত পটভূমি এতটা স্পষ্ট থাকেনা। সেক্ষেত্রে টুকরা বা করিডরের কাছ থেকে পটভূমিকে আলাদা ভাবে চিনে নিতে এর কতগুলো বৈশিষ্টকে ব্যবহার করা যায়।

পটভূমির মোট এলাকাটি পুরো দৃশ্যপটে অন্য উপাদানগুলোর চেয়ে বড় হওয়ার কথা। পটভূমিই দৃশ্যপটে এভাবে প্রাধান্য বিস্তার করবে এটিই পটভূমির প্রথম ও সব চেয়ে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট। উপরের মরুভূমির ও কৃষিজমির উদাহরণে ব্যাপারটি স্পষ্ট। কিন্তু

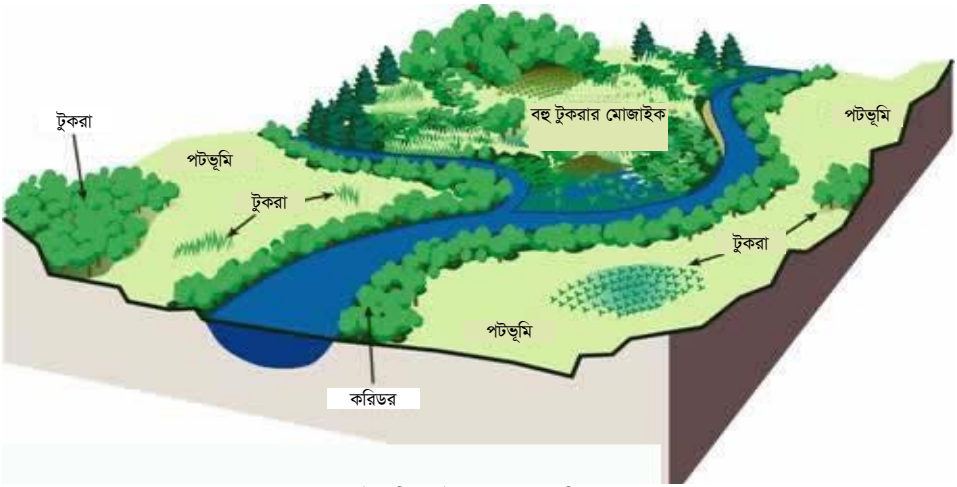

পটভূমিতে টুকরা আর করিডর

যদি কোন একটি উপাদান অন্যগুলোর চেয়ে স্পষ্টত ব্যাপকতর এলাকা দখল করেনা, তখন পটভূমি চিনতে আমাদেরকে অন্য বৈশিষ্টের সন্ধান করতে হয়। যে উপাদানটি দৃশ্যপটের সর্বত্র তার সব অংশের সঙ্গে সব চেয়ে ভাল ভাবে সংযুক্ত তাকেই পটভূমি

হিসেবে ধরে নেয়া উচিত। ছোট ছোট কৃষিজমির ছকগুলোকে যে ঝোপঝাড় সমৃদ্ধ আইলগুলো চিহ্নিত করে দিচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে সেই ঝোপ সারিগুলোই পটভূমি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে– কারণ এটি সর্বত্র সুসংবদ্ধ, দৃশ্যপটের সর্বত্র নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তার ব্যাপ্তি। একটি গ্রাফ পেপারের পটভূমি বা কাঠামোটি কী– তার উত্তরে যেমন আমরা যেই অনেকগুলো খাড়া ও আড়াআড়ি সরল লাইনগুলো ওতে আঁকা আছে তাদেরকেই বেছে নেব– সেটিও এই একই কারণে। এই যে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ঝোপ সারির সর্বত্র ব্যাপ্ত পাখি, পতঙ্গ, ছোট পশু ঘুরলে ফিরলেও কোন বাধা না পেয়ে শুধু পটভূমির মধ্যেই থেকে যেতে পারে, এই বিষয়টি কিন্তু ইকোলজির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন করিডর সৃষ্ট জালের মধ্যে ঐ প্রাণিগুলোর প্রত্যেকের দল বড় হতে পারে, পরস্পর সহজে যুক্ত হতে পারে, প্রজননও করতে পারে। আরো একটি বৈশিষ্ট পটভূমি চিনে নিতে সহায়ক হতে পারে, তা হলো কোন উপাদানটি দৃশ্যপটটির মধ্যেকার গতিবিধিকে বেশি নিয়ন্ত্রণ করছে তাকেই পটভূমি হিসেবে দেখা। এটি অবশ্য সব সময় সহজ কাজ নয়। যেমন ঐ আইলের ঝোপ সারিগুলো যদি বড় ঝোপ, গুল্ম এমনকি বৃক্ষ-সারি দিয়ে সমৃদ্ধ হয় তখন দেখা যায় যে ওখান থেকে পাখি, পতঙ্গ, পাতা, পরাগরেণু, উড়ন্ত বীজ ইত্যাদি উড়ে গিয়ে অন্য উপাদান– যেমন কৃষিজমির টুকরাগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। ওখানকার গাছের ছায়া জমি ফসলকে প্রভাবিত করছে– ইত্যাদি। সেই কারণেও ঐ আইলের সর্বত্র বিস্তৃত জালটি পটভূমি উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বিমান থেকে তোলা ছবি: পটভূমি, টুকরা আর করিডর

টুকরাগুলো যখন পটভূমি দিয়ে চারিদিক বেষ্টিত হয় আর তাদের মাঝে থাকে করিডরগুলো, তখন পুরো দৃশ্যপট একটি জালিকার রূপ নেয়। সরু করিডরগুলো নিজেও এক ধরনের সর্বব্যাপ্ত জালিকা সৃষ্টি করে। এই জালিকা ক্রমে ক্রমে রূপ বদলায়; কোথাও হয়তো শুধু প্রাকৃতিক কারণেই তার ধরন বদলায়– বিশেষ করে যে সব দুর্গম জায়গায় মানুষের হাত পড়েনা সেখানে। আর যেখানে মানুষের হাত সব সময় পড়ছে– অর্থনৈতিক সামাজিক এবং পারিবেশিক নানা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে– তখন মানুষই দৃশ্যপটের জালিকার ধরন পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা রাখে। যেমন পুরুষানুক্রমে জমি উত্তরাধিকারীদের কাছে ভাগ হওয়ার সময় জমি ক্রমাগত খণ্ড খণ্ড হয় এবং আইলের ঝোপ ইত্যাদির পরিমাণ ও বিন্যাসে পরিবর্তন আসে– যা প্রকারান্তে দৃশ্যপটের জালিকায় পরিবর্তন আনে। আবার উন্নত অনেক দেশে যান্ত্রিক কৃষির সুবিধার্থে এবং কৃষিজীবী কয়েকটি মাত্র পরিবারের কাছে জমি বাণিজ্যিকভাবে হস্তান্তরিত হবার কারণে জমির টুকরো বরং বৃহত্তর হচ্ছে, এবং এক্ষেত্রেও জালিকাটি বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের তৈরি রাস্তাঘাটও দৃশ্যপটের করিডর, এবং সে হিসাবে দৃশ্যপট জালিকা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। কাজেই দ্রুত নূতন নূতন রাস্তাঘাট তৈরির সঙ্গে সঙ্গেও ঐ জালিকা পরিবর্তিত হয়েছে।

টুকরা সৃষ্টির কারণ

টুকরা, করিডর ও পটভূমি নিয়ে এই যে প্রাকৃতিক কাঁথা, আমাদের কাছে তার প্রধান গুরুত্ব দৃশ্যপটের অভ্যন্তরের জীবজগতের উপর তার বিন্যাসের প্রভাবকে নিয়ে। যদিও কিছু কিছু টুকরা কার্যত জীবন-শূন্য হতে পারে, সাধারণ ভাবে দৃশ্যপটের টুকরাগুলোর বৈশিষ্টই হলো তার ভেতরে উদ্ভিদ আর প্রাণির জীবসমাজের কারণে।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে এই টুকরাগুলো সৃষ্টি হলো কী ভাবে? অর্থাৎ একটানা দৃশ্যপট না থেকে এভাবে খণ্ডিত দৃশ্যপট কেন সৃষ্টি হলো? টুকরা সৃষ্টির কারণগুলোকে আমরা মোটা দাগে কয়েক ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি। প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট যে কোন বিপর্যয়ে একটানা দৃশ্যপট টুকরা টুকরা হয়ে যেতে পারে– হতে পারে সেটি স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও বন কেটে ফেলা বা বনে আগুণ দেয়ার ফলে, কিংবা মত্ত হাতী স্থানে স্থানে এলোমেলো ভাবে মাড়িয়ে বন নষ্ট করার ফলে। আবার অনেক সময়

টুকরাগুলো পরিবেশগত ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে– গ্রামের কোথাও কোথাও জংলা এলাকা, আবার কোথাও পীট কয়লার স্যাতস্যাতে মাটির জায়গা, ইত্যাদি টুকরাতো নেহাতই পরিবেশ সম্পদেরই অংশ। আবার মানুষ নিজে যখন কৃষিকাজ, বনায়ন, চারণভূমি ইত্যাদির কারণে উদ্ভিদ বা প্রাণিকে বিশেষ বিশেষ খণ্ড খণ্ড জায়গায় অনুপ্রবেশ করায় তখনো নূতন টুকরা বিন্যাসের সৃষ্টি হয়। মানুষ যখন বাড়ি-ঘর তৈরি করে আবাস গড়ে তখন নিজেদেরকে অনুপ্রবেশ করিয়েও এ ধরনের টুকরার সৃষ্টি করে। এই কয়েক রকম কারণে টুকরা সৃষ্টির বিষয়ে বিজ্ঞানীদের একটি প্রধান কাজ হলো তার কোনটিতে জীবের বৈচিত্র বা বিকাশে ভালমন্দ কী ঘটে তা নির্ণয় করা।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে টুকরার সৃষ্টি

কোন ইকোসিষ্টেমে যখন বিপর্যয় ঘটে তখন সেখানে কী ঘটে সেটি আধুনিক ইকোলজির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এক্ষেত্রে যে নূতন টুকরাগুলো সৃষ্টি হয় তা হয় প্রায়ই অস্থায়ী। কিছুদিনের মধ্যে বিপর্যস্ত জায়গা পূর্বাবস্থায় ফেরৎ না যাওয়া পর্যন্ত এর স্থায়ীত্ব– যদি না অবশ্য পর পর একই রকম বিপর্যস্ত হতেই থাকে। এখানকার জীবসমাজের উপর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে বিপর্যয়ের পর প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো

জীবের প্রজাতিগুলোর একটি বড় অংশের জীব-সংখ্যা কমে যাওয়া, ধ্বংস হওয়া; এমনকি কোন কোন প্রজাতি এসব টুকরা থেকে বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো কিছু দিনের মধ্যে ঐ জীব-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এত বৃদ্ধি পায় যে বিপর্যয়পূর্ব অবস্থা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আবার অন্য দিকে নূতন নূতন প্রজাতি এসে বিপর্যস্ত খালি জায়গাতে কলোনি গড়তে পারে– যেমন বনের কোন জায়গায় বিপর্যয়ের ফলে ফাঁক দেখা গেলে তাতে বাইরে থেকে নূতন বীজ, স্পোর, প্রাণির আবির্ভাব ঘটে। সেখানে প্রজাতির পালাবদল হতে পারে, বিপর্যয়ের ধাক্কা টুকরাগুলো কাটিয়ে উঠে। কিন্তু তা হবার আগেই যদি পুনরায় বিপর্যয় আসে তা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। সে রকম অবস্থায় বহু বছর ধরে, এমন কি শত শত বছর ধরে সাধারণ দৃশ্যপটের মধ্যে এরকম ভিন্ন টুকরাগুলো স্থায়ীভাবে থাকতে পারে– যেমন বিস্তীর্ণ কৃষিজমির পটভূমির মধ্যে কিছু ঘন জংলা জায়গা। বিপর্যয়ের ফলে আরো এক রকমের টুকরা সৃষ্টি হতে পারে। পুরো পটভূমিতেই সাধারণ ভাবে বিপর্যয় এসে তাতে খানিকটা জায়গা যদি অবিপর্যস্ত থাকে তা হলে সেই স্বাভাবিক অংশটিই একটি টুকরা হতে পারে। যেমন অতীতের তৃণভূমির পটভূমি যদি মরুকরণে বিরান হয়ে যায় ও তাতে এক এক টুকরা তৃণভূমি শুধু বজায় থাকে তা হবে এরকম টুকরা, যে রকম টুকরাকে বলা হয় অবশিষ্ট টুকরা।

পরিবেশগত ভাবে টুকরার সৃষ্টি হয় এক এক জায়গায় পরিবেশগত সম্পদ– যেমন পানি, মাটি, পুষ্টিদ্রব্য ইত্যাদি পটভূমির থেকে ভিন্নতর হয় বলে। ফলে এসব টুকরার জীবসমাজও পটভূমির থেকে আলাদা হয়। সম্পদের পার্থক্যগুলো সাধারণত স্থায়ী প্রকৃতির হয় বলে টুকরাও এখানে স্থায়ী। এমন টুকরাতেও যে বিভিন্ন প্রজাতির জীব-সংখ্যায় উত্থান-পতন, বিলুপ্তি, আগমন-নির্গমন ইত্যাদি পরিবর্তন ঘটেনা তা নয়, তবে তা অন্যান্য ধরনের টুকরার চেয়ে কম।

জীবের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মানুষ যে সব টুকরার সৃষ্টি করে তাদেরকে অন্য জীবের অনুপ্রবেশ, আর মানুষের নিজের অনুপ্রবেশ– এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কৃষি, বাগান, গল্‌ফ কোর্স ইত্যাদিকে প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত করা যায়; আর আবাসিক এলাকায় মানুষ যেখানে নির্মাণাদি করে এবং তাতে ঘাসের লন, বাগান, বৃক্ষ কুঞ্জ ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে নিজের ও অন্যান্য জীবের থাকার ব্যবস্থা করে সেগুলোকে দ্বিতীয়টির

অন্তর্ভূক্ত করা যায়। তবে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে যখন মানুষ প্রথম আবাসিক এলাকা ইত্যাদি গড়ে তখন তাকে সেখানকার জন্য একটি বিপর্যয় হিসেবেই গণ্য করা যায়। মানুষের দ্বারা জীব আমদানীতে যে টুকরা গড়ে উঠে তার জীব সমাজে চার ধরনের প্রজাতিরা থাকতে পারে– মানুষ নিজেরা, মানুষের ইচ্ছে করে আনা উদ্ভিদ ও প্রাণি, অনৈচ্ছিকভাবে নিয়ে আসা উদ্ভিদ বা প্রাণি যা বালাই বা আগাছা হিসেবে পরিগণিত, এবং ঐ এলাকায় বরাবর থাকা জীব।

মানুষ দৃশ্যপটে নিজের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নিজেরাই যে রকম টুকরাগুলোর এবং করিডরের সৃষ্টি করে

টুকরার আকার, আকৃতি ও বিন্যাসের প্রভাব

আকার:

কোন টুকরায় একক আয়তনের পরিসরে যে শক্তি ও পুষ্টিদ্রব্য থাকে তা সাধারণত টুকরাটির আকারের উপর নির্ভর করেনা। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হয় যখন আমরা টুকরার কিনারার কাছে চলে আসি। যেমন ধরা যাক বিস্তীর্ণ কৃষিজমির পটভূমিতে রয়েছে গাছপালার ঝাড়ের একটি টুকরা, অথবা প্রায় পুরো বন পুড়ে যাওয়া পটভূমির মাঝে একটি অক্ষত বনাঞ্চলের টুকরা। দেখা যায় এরকম ক্ষেত্রে ঐ টুকরার কিনারার অঞ্চলগুলো টুকরার ভেতরের অঞ্চলের চেয়ে জীব-সম্পদে বেশি সমৃদ্ধ। উদ্ভিদ, প্রাণি সব মিলে কিনারার জৈব বস্তু ভেতরের চেয়ে বেশি। খুব সম্ভব কিনারায় অধিক

আলোক প্রাপ্তির বিষয়টিই এখানে কাজ করছে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তো বটেই কীটপতঙ্গ ও মেরুদন্ডী প্রাণির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি পরিমাপে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে বলা যায় কিনারার শক্তি ও পুষ্টিদ্রব্যের প্রাপ্তিও অপেক্ষাকৃত বেশি। এদিকে টুকরা যত ছোট হবে অভ্যন্তরের তুলনায় কিনারার পরিমাণ তত বেশি হবে। তাই শক্তি ও পুষ্টিদ্রব্যের প্রাপ্তির দিক থেকে ছোট টুকরার কিছু সুবিধা রয়েছে বৈকি।

জীববৈচিত্রের উপর টুকরার আকারের প্রভাবটি কী? এক্ষেত্রে স্থলভাগের দৃশ্যপটের বিষয়টি বিবেচনার আগে সমুদ্রের একটি দ্বীপের কথাটি চিন্তা করি– কারণ বিচ্ছিন্ন টুকরা হিসেবে এর চেয়ে বিচ্ছিন্ন আর কিছু নেই। জনবসতিহীন ছোট দ্বীপে সব রকমের জীব নষ্ট করে দিয়ে এবং নূতন ভাবে সেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীববৈচিত্র সৃষ্টি লক্ষ্য করে (বাইরে থেকে প্রজাতিগুলো আসার ফলে) এ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান নিয়ামকের উপর জীববৈচিত্র নির্ভর করে। দ্বীপটি (টুকরাটি) যত বড় হবে বৈচিত্র তত বেশি হবে। এটি খুব সম্ভব বড় টুকরায় বেশি ভূবন বৈচিত্রের কারণেই হয়ে থাকে। বড় দ্বীপে বেশি রকমের পারিবেশিক বৈচিত্র থাকবে, তাই নানা রকম ভূবন পেয়ে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক প্রজাতি স্থান করে নেবে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভূবন বৈচিত্র থাকেনা, অর্থাৎ দ্বীপটির মধ্যে পারিবেশিক বৈচিত্র তেমন থাকেনা সেক্ষেত্রেও বড় দ্বীপে বেশি প্রজাতির সুযোগ ঘটে– হয়তো প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয় বিচরণক্ষেত্র বেশি পায় বলে। দ্বীপটি মূল ভূখণ্ড থেকে অথবা অন্য বড় দ্বীপের থেকে (অন্য টুকরার থেকে) কত দূরে তার উপরও জীববৈচিত্র নির্ভর করে। বেশি দূর হলে জীববৈচিত্র কম হয়। কারণ মূল ভূখণ্ড থেকেই তো প্রজাতিগুলোকে শুরুতে আসতে হয়। এই আসতে সময় লাগার কারণে দ্বীপ যত পুরানো হবে, অথবা প্রজাতি ধ্বংসের পর যত সময় গড়াবে জীববৈচিত্র তত বেশি হবে। এগুলো সবই বেশ বোধগম্য; তবে টুকরার আকার, দূরত্ব এসব নিয়ামকগুলোর প্রত্যেকটির আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো স্পষ্ট নয়। একটি কথা স্পষ্ট যে সমুদ্রের দৃশ্যপটে টুকরার ক্ষেত্রে খুব সম্ভব তার তুলনামূলক বেশি বিচ্ছিন্নতার কারণে টুকরার আয়তনের উপর জীববৈচিত্র তত জোরালো ভাবে নির্ভর করেনা।

স্থলভাগের দৃশ্যপটে ব্যাপারটি ভিন্ন রকম। এখানে পটভূমি থেকে, এবং করিডরের মাধ্যমে নূতন প্রজাতি টুকরায় আসার সুযোগ অনেক বেশি। তাই টুকরা যত বড় হয়

জীববৈচিত্রকে তত বেশি স্থান দিতে পারার ব্যাপারটি বেশ জোরালো ভাবে ঘটে। আজ যে অনেক বনভূমি, বিশেষ করে বড় রেইন ফরেষ্টগুলো মানুষের হস্তক্ষেপে ক্রমে টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে, এবং টুকরাগুলো ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাতে সেখানে জীববৈচিত্র মারাত্মক ভাবে হুমকির মুখে পড়ছে। দ্বীপের মত অন্য নিয়ামকগুলো অবশ্য এখানেও আছে– টুকরায় পরিবেশিক বৈচিত্র, টুকরাগুলোর পারস্পরিক নৈকট্য, টুকরার বয়স, এমনকি পটভূমিতে পারিবেশিক বৈচিত্র ইত্যাদিও জীববৈচিত্রে ইতিবাচক অবদান রাখে। তবে স্থল ভাগে খুব সম্ভব টুকরার আয়তনটিই এক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আকৃতি:

আমরা টুকরার কিনারার সঙ্গে টুকরার অভ্যন্তরের প্রভেদ, ও জীব-সংখ্যার উপর এই প্রভেদের প্রভাব দেখেছি। একই কারণে টুকরার আয়তন শুধু নয়, এর আকৃতিটিও গুরুত্বপূর্ণ। পরিধির (কিনারার দৈর্ঘ) ও আয়তনের অনুপাত জ্যামিতি থেকে হিসেবে করলে বৃত্তাকার স্থানের জন্য আয়তনের তুলনায় কিনারা সব চেয়ে কম, বর্গাকার ক্ষেত্রেও কম, কিন্তু যত আয়তাকার বা লম্বাটে হবে কিনারা তত বেশি হবে, আর জিগ্‌জাগ্‌ বা এলোমেলো কিনারার ক্ষেত্রেও এটি যথেষ্ট বেশি হবে। প্রাণি যখন খাদ্যান্বষেণে বের হয় অথবা ছড়িয়ে পড়তে চায় (উদ্ভিদের বীজ ছড়াবার ক্ষেত্রেও) তখন একটি টুকরা তার বরাবর সামনে পড়লে তাতে সে ঢুকে পড়বে। বরাবর সামনে না পড়লে টুকরাটির পাশ দিয়ে চলে যেতে পারবে। টুকরাটির কিনারা কম হলে এ ভাবে পাশ দিয়ে চলে যাবার সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু একই আয়তনের একটি অনেক লম্বাটে টুকরা

টুকরার কিনারায় থাকা স্বভাব এমন একটি প্রজাতি

যদি আড়াআড়ি তার সামনে থাকে সে ক্ষেত্রে একে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এক্ষেত্রে টুকরার আকৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ হলো বটে, তবে তার কৌণিক অবস্থানটিও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন লম্বাটে টুকরাটি যদি আড়াআড়ি না থেকে প্রাণির গতিপথের সমান্তরাল হয় তবে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃত্তাকার টুকরা থেকেও বেশি হবে।

জীববৈচিত্রের দিক থেকে কিনারা আর অভ্যন্তর উভয়ের সুবিধা অসুবিধা দুইই রয়েছে। এটি নির্ভর করে কী ধরনের জীবের কথা আবার বলছি তার উপর। কোন কোন প্রজাতি কিনারাতেই ভাল থাকে– এরা টুকরার বাইরে প্রায়শ বিচরণ করতে ও বাইরে থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পটু– যেমন কাক অথবা হরিণ অথবা ভালুক। কিনারা দীর্ঘ হলে এসব প্রজাতির বৈচিত্র বাড়ে। আবার অনেক প্রজাতি শুধু টুকরার যথেষ্ট অভ্যন্তরেই থাকতে চায়– যেমন কিছু পাখি,উল্লুক অথবা গরিলা বনের গভীরে লুকিয়ে থাকা পছন্দ করে। তাদের বৈচিত্রের জন্য যত কম কিনারা থাকে তত ভাল। আবার টুকরাতে কতখানি প্রশস্ত জায়গার ফালিকে কিনারা হিসেবে বিবেচনা করা হবে সেটিও একটি বিষয়– তা প্রজাতি ভেদে ভিন্ন ভাবে দেখা হতে পারে। যেমন বনের টুকরায় পাখি, কাঠবিড়ালি, বানর ইত্যাদি বৃক্ষবাসির জন্য কিনারা বলতে খুব সরু জায়গা

টুকরার অভ্যন্তরে থাকা প্রাণি

বুঝায়। এর একটু বেশি ভেতরে থাকলে অভ্যন্তরের প্রাণির সঙ্গে তাদের আচরণের তেমন কোন পার্থক্য থাকেনা। অন্যদিকে প্রজাপতির ক্ষেত্রে অথবা গুল্ম, মস্ প্রভৃতি মাটির সঙ্গে লেগে থাকা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বেশ প্রশস্ত কিনারা জুড়ে এরা থাকে– কিনারার প্রজাতি হিসেবেই, কারণ ওভাবে প্রশস্ত জায়গায় থাকলেও তাদের সব লেনদেন ঘটে বাইরের সঙ্গে।

‘

বিন্যাস:

একটি এলাকায় অভয়াশ্রম (রিজার্ভ) সৃষ্টি করে যখন স্থানীয় জীববৈচিত্রকে রক্ষার আয়োজন করা হয়, তখন একটি প্রশ্ন প্রায়শ উঠে– সেখানে একটি বড় অভয়াশ্রম তৈরি করে কি বেশি জীববৈচিত্র রক্ষা করা যাবে, না কয়েকটি ছোট ছোট অভয়াশ্রম

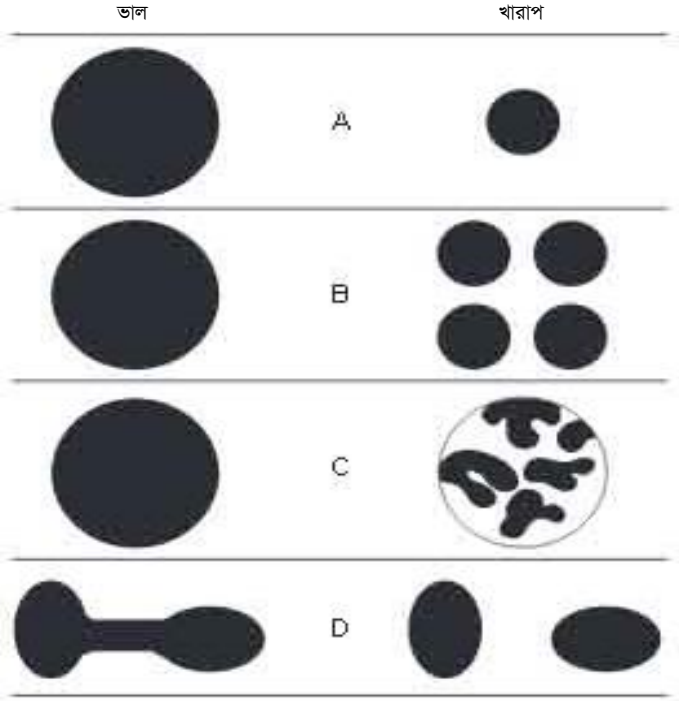

তুলনামূলক ভাবে টুকরার আকার ও আকৃতি যেমন হওয়া জীববৈচিত্রের জন্য ভাল। A ছোট হওয়ার চেয়ে বড় হওয়া ভাল। B বেশি টুকরায় বিভক্ত থাকার চেয়ে একটি বড় টুকরা হওয়া ভাল। C অনিয়মিত আকৃতিতে খণ্ডে খণ্ডে থাকার চেয়ে নিয়মিত আকৃতিতে একত্রে থাকা ভাল। D দুটি টুকরা বিচ্ছিন্ন থাকার চেয়ে প্রশস্ত করিডর দিয়ে সংযুক্ত থাকা ভাল।

তৈরি করে তা ভাল করা যাবে। যেটুকু গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে যদি অপেক্ষাকৃত সীমিত এলাকার কথা বিবেচনা করি তা হলে একটি অভয়াশ্রম করাই ভাল। কিন্তু এলাকাটি যদি যথেষ্ট বিস্তৃত হয় তা হলে এর বিভিন্ন স্থানে অভয়াশ্রমের কয়েকটি টুকরা করা দরকার এবং তাদের প্রত্যেকটিকে যত বড় করা যায় তা করা উচিত। এর কারণ হলো সব টুকরায় কিনারার প্রজাতিগুলো প্রায় একই রকমের হয়। কিন্তু বড় টুকরায় এই কিনারার প্রজাতিতো থাকেই তার উপর এমন কিছু সংবেদশীল অভ্যন্তরীণ প্রজাতিও থাকতে পারে যারা শুধু গহীন অভ্যন্তরে থাকতে পারে– তা শুধু বড় টুকরাতেই সম্ভব। কিন্তু এলাকাটি অনেক বিস্তৃত হলে তার এক এক অংশের আবার আরো স্থানীয় ভাবে বিশেষ কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণির সুবিধা থাকতে পারে বলে প্রত্যেক অংশে আলাদা অভয়াশ্রম করাটি দরকার হয়ে পড়ে– কোন এক অংশে শুধু যথেষ্ট বড় করেও একটিতে ঐ বিশেষ সব প্রাণিকে পাওয়া যাবেনা।

কোন দৃশ্যপটকে বুঝতে গেলে তাই তার মধ্যে টুকরার সংখ্যা, এদের আয়তন, আকৃতি, কৌণিক অবস্থান ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় টুকরাগুলোর বিন্যাসকেও বিবেচনা করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ যদি আমরা কতগুলো ঘর নিয়ে এক একটি বাড়িকে একটি মানব আবাসিক এলাকার এক একটি টুকরা হিসেবে বিবেচনা করি, তা হলে এক ধরনের বিন্যাসে এরকম দশটি বাড়ি বিশাল চাষের জমির এক প্রান্তে কাছাকাছি জায়গায় পরস্পর গা ঘেঁষে থাকতে পারে। অথবা অন্য একটি বিন্যাসে এই চাষের জমির সবটা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়েও ঐ দশটি বাড়ি থাকতে পারে। প্রথম দৃশ্যপটটিতে এক বাড়ি থেকে যে কেউ সহজে আরেক বাড়িতে গিয়ে যে কোন সময় কাজ করতে পারে, লবণ ধার আনতে পারে, প্রেমালাপ করতে পারে। এমনকি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ইত্যাদি শেয়ার করতে পারে সব বাড়ির মধ্যে। দ্বিতীয় দৃশ্যপটটিতে এগুলোর কোনটিই সহজ হয়না। মানব সমাজের মত জীবসমাজেও এভাবে শক্তির, পুষ্টিদ্রব্যের, প্রজাতির প্রবাহ অনেকটাই টুকরাগুলোর বিন্যাসের উপর নির্ভর করে।

করিডর কী ও এগুলোর উৎস

অপেক্ষাকৃত সরু কোন জায়গা যদি দৃশ্যপটের পটভূমির থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে তাকেই সাধারণত আমরা করিডর বলি। পটভূমির মধ্য দিযে যাওয়া হাঁটা পথ, সড়ক,

রেল রাস্তা ইত্যাদি সব ধরনের চলাচলের জায়গা যেমন করিডর হতে পারে, তেমনি বিদ্যুতের লাইন নেবার জন্য সরু করে কাটা জায়গা, নদী বা খাল, জমির আইল, জমি বিভক্ত করা ঝোপ সারি, পথের ধারে বৃক্ষ সারি, ইত্যাদি বহু কিছুই এ রকম করিডর হতে পারে। এরকম একটি করিডর নিজে একেবারে বিচ্ছিন্ন কিছু হতে পারে, দুই প্রান্তের কোন কিছুকে যোগ না করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো একই রকম অবস্থার টুকরার সঙ্গে যুক্ত থাকে– দুই প্রান্তে, অথবা অন্তত এক প্রান্তে। যেমন ঝোপ সারিগুলো সাধারণত দুটি বনাঞ্চলকে বা বৃক্ষের বাগানকে যুক্ত করে, রাস্তার বা খালের পাশের বৃক্ষ সারিগুলোও তাই করে। পাকা সড়ক সাধারণত যোগ করে শহরের কোন বাঁধানো চত্বর বা ভবনের বাঁধানো আঙ্গিনাকে; এমনি ভাবে অন্য করিডরও করে।

আমরা দেখলাম করিডর একই সঙ্গে দৃশ্যপটকে বিভক্তও করে, আবার এর টুকরাগুলোকে যুক্ত করেও রাখে। ইকো-সিস্টেমের প্রাণিরা করিডরগুলোকে তাদের যাতায়তের পথ হিসেবে ব্যবহার করে, অনেক ক্ষেত্রে বসবাসেরও। শিকারি যখন শিকারকে তাড়া করে তখন এই করিডরগুলো শিকারি ও শিকার উভয়েই পথ হিসেবে

ঝোপ সারি আর বৃক্ষ সারির করিডর

ব্যবহার করে– অনেক সময় এগুলোর সঙ্গে ভাল পরিচিতির উপর শিকারির সাফল্য এবং শিকারের বাঁচামরা নির্ভর করে। আমরাও অনেক ভাবে করিডরকে ব্যবহার করি,

যাতায়তের জন্য তো বটেই। আইল বা ঝোপ সারিকে আমরা জমি বিভক্ত করতে ব্যবহার করি। বেড়া বা দেয়াল দেয়ার জন্য যে করিডর তা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন ক্ষতিকর প্রাণি থেকে। করিডর থেকে আমরা কখনো কখনো রসদও পাই– যেমন রাস্তার পাশের বৃক্ষ সারি থেকে কাঠ বা ফল, চট্টগ্রামের কোন কোন অঞ্চলে বরবটি ইত্যাদি সব্জী প্রচুর উৎপন্ন হয় জমির আইলে লাগানো সব্জী চারা থেকে। প্রাকৃতিক ভাবেও অনেক করিডর কিছু কিছু প্রজাতির জন্য ভাল আবাস। যেমন ঝোপ সারিগুলো বিচিত্র সব প্রজাপতি, ও কীট পতঙ্গের আবাস। অনেক দেশে আবার উঁচু ঝোপ সারি বা বৃক্ষ সারি তৈরি করা হয় সর্বক্ষণ প্রচণ্ড বাতাস থেকে জমির ফসলকে রক্ষা করার জন্য– কারণ বেশি বাতাসে জমি আর্দ্রতা হারায়। আর দৃশ্যপটের সৌন্দর্য বৃদ্ধিও করিডরের একটি প্রধান কাজ বলে বিবেচিত হয়।

আড়াল করা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য ঝোপ সারির করিডর; এবং রাস্তার করিডর

করিডর সৃষ্টির প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সব কারণগুলোকে যদি আমরা শ্রেণী বিভাজন করতে চাই তা হলে টুকরা সৃষ্টির কারণের মত একই কারণগুলো এক্ষেত্রেও পাব। অনেকগুলো করিডর পটভূমির সরু কিছু জায়গায় বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্টি হয়। আবার সরু এক ফালি জায়গা ছাড়া বাকি পটভূমি বিপর্যস্ত হয়ে অবশিষ্ট ধরনের করিডরও

সৃষ্টি হতে পারে। সরু বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট করিডরের উদাহরণ হতে পারে দাবানল অপেক্ষাকৃত সরু জায়গা পুড়তে পুড়তে এগিয়ে গেলে, বা বনের মধ্য দিয়ে গাছ কেটে রাস্তা তৈরি করলে, বা হাতির ঝাক এভাবে সরু পথ করে সব উদ্ভিদ মথিত করে এগিয়ে গিয়ে বনের পটভূমিতে ফাঁকা করিডর বানালে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ অবশিষ্ট করিডরের উদাহরণ হতে পারে বন কাটার পর ওখানে অক্ষত থাকা একটি বৃক্ষ সারি। পরিবেশ-সম্পদ সরু জায়গা ধরে বিন্যস্ত থাকলে পরিবেশগত করিডর সৃষ্টি হতে পারে– নদী যেভাবে পানি সম্পদের মাধ্যমে করিডরের সৃষ্টি করে। মানুষ সৃষ্ট ব্যবস্থায় মানুষ নিজের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বা অন্য ভাবে জীবের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে করিডর সৃষ্টি হয়– ধূধূ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে মহাসড়ক তৈরি হলে, কৃষিজমির মাঝে ঝোপসারি সৃষ্টি করলে এমন করিডর সৃষ্টি হয়।

নানা করিডরের বৈশিষ্ট

করিডরের বৈশিষ্ট, বিশেষ করে এখানে জীবের আবরণ ও জীববৈচিত্রের বৈশিষ্টগুলো, দেখতে গিয়ে গঠনের দিক থেকে করিডরগুলো তিন ভাগে ভাগ করে দেখা যায়– রেখা করিডর, ফালি করিডর এবং জলস্রোত করিডর। স্পষ্টত এদের বিভিন্নটির মধ্যে ঐ বৈশিষ্টগুলো বেশ আলাদা হবে।

রেখা করিডর অপেক্ষাকৃত বেশি সরু আকৃতির– যেমন রাস্তা (দু পাশের সীমানায় গাছপালা সহ), রেল রাস্তা, বাঁধ, নালা, বিদ্যুৎ পাওয়ার লাইন, ঝোপ সারি, বৃক্ষ সারি ইত্যাদি। এর মধ্যে ঝোপ সারি ও বৃক্ষ সারি ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে পটভূমির সরু একটি অংশকে ফাঁকা করার মাধ্যমেই করিডরের সৃষ্টি তাই রাস্তা-জাতীয় এই করিডরগুলোর মাঝখানের জায়গায় তেমন কোন জীবের স্থায়ী আবাস দেখা যায় না। কিন্তু এদের দুই পাশের কিনারায় বেশ কিছু কিনারা-প্রজাতি থাকতে পারে, যেমন দুপাশের গাছপালায়। তবে জীববৈচিত্রের দিক থেকে ঝোপ সারির মত রেখা করিডরই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঝোপসারি মানুষ যেমন সৃষ্টি করতে পারে তেমনি প্রাকৃতিক ভাবেও এটি সৃষ্টি হতে পারে। সব ঝোপের গাছ-পালাগুলোর বৈচিত্র প্রাকৃতিক কারণেও গড়ে উঠে– বিশেষ করে ওর মধ্যে ক্ষুদ্রজলবায়ু গত (মাইক্রো-ক্লাইমেট) বৈচিত্রের ফলে। যেমন পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হওয়া ঝোপ সারির একপাশ সব সময়

ছায়াতে থাকাতে ওদিকে মস ও ক্ষুদ্র গুল্ম বেশি থাকে, আবার রোদেলা দিকে কাষ্ঠময় উদ্ভিদ বেশি থাকে। প্রাণির মধ্যে পাখি আর কীট-পতঙ্গের আধিক্যই ঝোপ সারিতে রয়েছে। সেখানকার উদ্ভিদের পাকা ফল পাখিকে যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনি পাখির বয়ে আনা বীজ ঝোপ সারিকে আরো উদ্ভিদে সমৃদ্ধ করে। স্তন্যপায়ীর মধ্যে ইঁদুর, কাঠবিড়ালি জাতীয় ছোটরাই থাকে বেশি। যে সব দৃশ্যপটে বনাঞ্চল কম সেখানে জীববৈচিত্রের জন্য ঝোপ সারির গুরুত্ব খুব বেশি– ওখানকার বন্য প্রাণি বলতে গেলে এই ঝোপ সারিরই প্রাণি।

ফালি করিডর অপেক্ষাকৃত চওড়া আকৃতির। এদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম– খুবই প্রশস্ত মহাসড়ক যার দু'পাশে নিজস্ব অনেকখানি জায়গা, বড় আকারে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা, চওড়া বনের ফালি ইত্যাদি এই দলে পড়বে। এগুলোর বৈশিষ্ট হলো এদেরও একটি অভ্যন্তর অঞ্চল আছে। আর এর যে দুপাশের কিনারা অঞ্চল তা নিজেই এক রকম রেখা করিডর হিসেবে কাজ করতে পারে। এর ফলে টুকরার অভ্যন্তর ও কিনারার মধ্যে বৈশিষ্টের যে তফাতগুলো দেখা দেয় এই ক্ষেত্রেও সেগুলো কিছুটা দেখা দিতে পার। যেমন বনের ফালির করিডরের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরের প্রাণি আর কিনারার প্রাণির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে।

জলস্রোত করিডর নদী বা অনুরূপ কোন জলস্রোতের দুই কূলের যে অঞ্চল সাধারণ পটভূমির থেকে ভিন্ন তা নিয়েই তৈরি হয়। নদীর সংলগ্ন অববাহিকা এবং এর উপরের পাড় এ করিডরের অন্তর্ভূক্ত হয়। এরকম করিডর পানির এবং আনুসঙ্গিক পুষ্টিদ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা রাখে বা এখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণির উপর স্পষ্ট ছাপ রাখে। পটভূমি অঞ্চলের প্রাণির চলাচলে এই করিডর বিভিন্ন প্রজাতির উপর বিভিন্ন প্রভাব রাখে, কারণ কিছু প্রাণি কাদা-জলার উপর দিয়ে দিব্যি চলাচল করতে পারে, অন্যরা পারেনা। শেষোক্তগুলো অবশ্য উঁচু পাড়ের অংশ ব্যবহার করতে পারে। যে সব জায়গায় ঋতু পরিবর্তনের বা বিভিন্ন আবহাওয়ার সঙ্গে নদীর পানির উচ্চতায় হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে যেখানে করিডরে দুই দিকে পানির উঠা নামা ঘটে– এবং করিডর প্রজাতির বিন্যাসে ও তাদের চলাচলে পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের মত পরিবর্তনশীল নদীগুলোতে প্রায়শই এই করিডরের গতি পবির্তনের, বা ভাঙ্গনের ফলে আরো বড় পরিবর্তন দেখা দেয়। এরকম করিডরের যে জলস্রোত তা কিন্তু নানা রকম হতে

পারে। সাধারণ খাল, ছোট নদী, পাহাড়ী ঝরণা বা ছরা, থেকে শুরু করে বড় নদী ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়। এতে দুই কিনারায় বা কূলে থাকা উদ্ভিদ ইত্যাদির একটি প্রভাব কিন্তু জলস্রোতের উপরও গিয়ে পড়ে। দীর্ঘ গাছের পত্রছায়া যদি পানির উপর পড়ে নদীর পানি অপেক্ষাকৃত কম আলো পায়, ও পানির উষ্ণতা কমে যায়, যা মাছ, মাৎস্য প্রাণি, ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। কিনারার উদ্ভিদ থেকে, যদি পাতা বা ডালপালা নদী বা খালে পড়ে সেগুলোর কারণেও প্রাণির জন্য উর্বরতা, আশ্রয় ইত্যাদিতে পার্থক্য ঘটে।

বাংলাদেশের দৃশ্যপট জলস্রোত করিডরের অসংখ্য উদাহরণে ভর্তি। এর মধ্যে কিছু কিছু তার জীব বৈশিষ্টে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন সিলেটের গোয়াইন নদীর কিনারায় রাতারগুল জলার বন। এখানে মিঠা পানিতে ডুবে থাকা বন জীববৈচিত্রের এক চমৎকার আকর– উদ্ভিদের মধ্যে করচ, হিজল, ঢোলকলমি, মুর্তা, রত্তন, আসাম লতা; প্রাণির মধ্যে নানা রকম জলার পাখি, শেয়াল, মেছো বেড়াল, বানর তো আছেই, আর আছে কীট পতঙ্গ অসংখ্য। সুন্দরবনের খালের ও নদীর কিনারার উদ্ভিদ ও প্রাণির কারণে এই ম্যাংগ্রোভ জলস্রোত করিডর খুবই বিশিষ্ট– যার কারণ মিঠা ও

জলস্রোত করিডর

নোনা পানির মিশ্রণ। কিনারার জলায় গোলপাতা এবং অনুচ্চ অন্যান্য কিছু ম্যাংগ্রোভ গাছ এর প্রধান উদ্ভিদ বৈশিষ্ট; আর পানিতে, কাদায় ও উদ্ভিদের আশ্রয়ে প্রাণির সংখ্যাতো অনেক। আবার গাজীপুরে টঙ্গি খালের দুই কিনারায় বিস্তীর্ণ যে মৌসুমি জলা তার প্রকৃতি কিন্তু খুবই আলাদা এবং পরিবর্তনশীল। শুকনা মৌসুমে এখানে হয় ধানের চাষ, বর্ষায় এটি নানা মাছের উর্বর ক্ষেত্র।

দৃশ্যপটের জালিকা

পটভূমি, নানা টুকরা ও নানা করিডর মিলে দৃশ্যপটে যে জালিকারূপী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেটি আমরা দেখেছি। জালিকার খোপগুলো (ম্যাশ) সাধারণত চারিদিকে করিডর ইত্যাদি দিয়ে ঘেরা থাকে। যেখানে টুকরা বড় বড় হয়, অথবা অনেকগুলো ছোট ছোট টুকরায় সারা পটভূমি জুড়ে থাকে (যাকে বলা হয় পটভূমির অধিক সছিদ্রতা) তখন ঐ ঘিরে রাখার কাজটি করে কাছাকাছি দুটি টুকরার মাঝে পটভূমির ফালিগুলো। অন্যত্র করিডর দিয়েই ঘেরা থাকে জালিকার খোপগুলো– যেমন আইল দিয়ে, অথবা নালা দিয়ে, অথবা ঝোপ সারি দিয়ে কৃষিক্ষেত; রাস্তা দিয়ে অথবা খাল বা নদী দিয়ে বন বা বৃক্ষ বাগান, বা তৃণভূমি ইত্যাদি।

যা দিয়েই জালিকার খোপগুলো তৈরি হোক না কেন, এক একটি খোপের কিনারায় বিভিন্ন দিক থেকে আসা ঘেরের রেখা বা ফালিগুলো পরস্পর ছেদ করে। ঐ ছেদের জায়গাগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ– কারণ সেখানে তা বড় হয়ে একটি গুটিতে (নোড) পরিণত হয় কিন্তু এত বড় গুটি হয়না যে তাকে দৃশ্যপটের একটি পৃথক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আমরা নানা দিকের ঝোপ সারির ছেদের জায়গাকে এরকম গুটির উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি আলোচনার খাতিরে। এক্ষেত্রে ছেদ বিন্দুর গুটিটি হবে একটি ঝোপ কুঞ্জের মত। ঐ ছেদের জায়গাগুলোতে প্রজাতিবৈচিত্র ঝোপ সারির অন্যান্য অংশের চেয়ে ভিন্ন হতে এবং বেশি হতে দেখা গেছে। এ গুটির অভ্যন্তরের প্রজাতি অন্য জায়গা থেকে বৈশিষ্টময় হতে পারে, এবং গুটির কেন্দ্র থেকে ঝোপ সারির দিকে বা টুকরার দিকে যত যাওয়া যাবে এই অভ্যন্তরের প্রজাতিগুলোর প্রাধান্য তত কমে যায়। কিনারার প্রজাতিগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্য দূরত্বের এমন প্রভাব বড় একটা দেখা যায়না। ছেদের জায়গায় এই বৈশিষ্টের কারণ হলো তার

ক্ষুদ্রজলবায়ুর ভিন্নতা– কারণ ওখানে বাতাসের বেগ কমে যায়, ছায়া বেশি হয়, আর্দ্রতাও বেশি হয়। অন্যসব রকম করিডরের ছেদের জায়গাতেও মূল করিডর থেকে কিছুটা ভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট থাকে। যেমন রাস্তার ছেদের জায়গায় চত্বর সৃষ্টি হয়, যার অনেক গুণাগুন এবং যাতে প্রজাতি সমাগমও ভিন্ন প্রকৃতির হয়। কোন কোন শহরের এরকম চত্বরে পায়রা ইত্যাদি পাখি সমাগমের কথাটি এখানে উল্লেখ করা যায়। মানুষের সমাগমও তো এখানে ভিন্ন। নদীর সঙ্গম স্থলের বিবেচনা করলেও বিষয়টি বেশ স্পষ্ট– নদীর অভ্যন্তরের সম্পদের ক্ষেত্রে তো বটেই কিনারার নানা প্রজাতির ক্ষেত্রেও সঙ্গম স্থলের ভিন্ন প্রকৃতিটি লক্ষণীয়।

জালিকার খোপের সৃষ্টিকারী করিডর ইত্যাদি উপাদানগুলো একদিকে খোপগুলোকে যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে ঘেরাটোপ দিয়ে রাখে যা এক খোপ থেকে অন্য খোপে প্রজাতি চলাচলকে বাধা দেয়, আবার কোন কোন প্রজাতির জন্য এগুলোই চলাচলের ভাল পথের কাজ করে। সেক্ষেত্রে জালিকাটি যেন শিরার জালিকা যার মধ্যে দিয়ে নানা দিকে প্রজাতি প্রবাহ চলতে পারে, এবং এভাবে তাদের বহু রকম বিকল্প পথ থাকে চলাচলের। সে ক্ষেত্রে ঐ পথ কোথাও কোথাও যদি ভাঙ্গা থাকে অথবা বিপর্যস্ত থাকে, তবুও চলাচলে বিঘ্ন ঘটেনা।

দৃশ্যপটের জালিকা ও তার খোপ

প্রজাতি-বৈচিত্রের জন্য খোপের আয়তনটি গুরুত্বপূর্ণ। জালিকায় সব খোপ একেবারে সমান হবে এমন কথা নেই; তাই এখানে গড়পড়তা আয়তনের কথা বলা হচ্ছে। প্রজাতির উপর এই আয়তনের প্রভাবটি নির্ভর করবে প্রজাতিটির 'কার্যকর সাইজের' উপর। এই কার্যকর সাইজটি আসলে ঐ জীবের দেহের সাইজ নয়; বরং নিজের খাদ্য সংগ্রহ, বাসার চারিদিকে নিরাপদ বলয় গড়া, সূর্যকিরণ ও পানি সঠিক পরিমাণে পাওয়া ইত্যাদি কাজে যেটুকু এলাকায় তার বিচরণ এবং যা তার নিজের জন্যই প্রয়োজন সেটিই এর কার্যকর সাইজ। যে প্রজাতিগুলো খোপের বা টুকরার মধ্যে থাকে, করিডর প্রভৃতি বেড়ির মধ্যে নয়, তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর সাইজ যদি খোপের আয়তনের চেয়ে বড় হয়, তাহলে মনে করা যেতে পারে যে সেই প্রজাতি কার্যত দৃশ্যপটের ঐ জালিকায় আটকা পড়ে বেকায়দায় পড়ে গেছে, তার জীবন যাপন একেবারেই বন্দী অবস্থায়; সেটি তার বিকাশ এমনকি টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট অনুকূল নয়। একই দৃশ্যপট জালিকায় খোপের চেয়ে ছোট কার্যকর সাইজের প্রজাতির কিন্তু এই সমস্যা থাকবেনা। যেমন কোন দৃশ্যপটে ধরা যাক জালিকা গড়ে উঠেছে নালার করিডরে আবদ্ধ তৃণভূমির নানা মাঠ দিয়ে তা হলে সে মাঠের খোপ যদি খুব বেশি ছোট হয় সেখানকার মেঠো ইঁদুরের জন্য ব্যাপারটি সুখকর হবেনা, তার সংখ্যা কমে যাবে। কিন্তু খোপের একই আয়তনের জন্য সেখানকার কেঁচোর হয়তো অসুবিধা হবে না কারণ তার কার্যকর সাইজ ইঁদুরের চেয়ে ছোট। আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এক সময় প্রচুর শিঙ্গেল হরিণ ঘুরে ফিরে বেড়াত। এখন সড়ক নির্মাণের পরিমাণ যত বাড়ছে হরিণের সংখ্যা তত কমে যাচ্ছে। কারণ সড়কের দ্বারা আবদ্ধ টুকরাগুলোর আয়তন সড়ক বৃদ্ধির ফলে ছোট হয়ে যাচ্ছে, হরিণের কার্যকর সাইজের তুলনায়।

এর ঠিক উল্টোটা ঘটতে পারে খোপের যে সব প্রজাতিকে চারিদিকে করিডর থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে। যেমন ঝোপ সারিতে ঘেরা মাঠের গুবরে পোকার কার্যকর সাইজ ছোট হওয়াতে খোপের আয়তন তুলনামূলকভাবে বড় হলে তার জন্য মাঠের কিনারায় ঝোপ সারি থেকে ঐ রসদ সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে এবং সে সংকটে পড়ে। কিন্তু একই খোপের আয়তন হয়তো ওখানকার প্যাঁচার জন্য অসুবিধাজনক হয় না কারণ তার কার্যকর সাইজ বড় হওয়াতে করিডরের রসদ তার আওতায় মাধ্যেই থাকে।

স্পষ্টত জালিকার মধ্যে যা রয়েছে তাদের বৈশিষ্ট– তাদের আয়তন (খোপের আয়তন, প্রজাতির কার্যকর সাইজ), আকৃতি, প্রজাতিবৈচিত্র, মানুষের হস্তক্ষেপ এই সব কিছু পুরো জালিকার উপর বড় প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্যে জালিকার খোপ কত বড় বা ছোট সেটি আগাগোড়া ইকোসিস্টেমের উপর খুব বড় প্রভাব রাখে।

দৃশ্যপটে টুকরা ইত্যাদির বিন্যাস

পটভূমি, টুকরা, ও করিডরের বিন্যাস শুধু দৃশ্যপট দেখতে কেমন হবে তাই নির্ধারণ করেনা, এতে থাকা জীববৈচিত্রের দিক থেকে দৃশ্যপটের কার্যকারিতাকেও নির্ধারণ করে। এ বিন্যাস যে অসংখ্য রকমের হতে পারে তা খুব স্বাভাবিক। তাত্ত্বিক ডিজাইনের দিক থেকে আমরা এগুলোর নানা বন্টনে নানা বিন্যাস কল্পনা করতে পারি – দানা আকৃতির টুকরাগুলো মালার মত গাঁথা রূপে, ছোট ছোট টুকরার গুচ্ছ রূপে, বড় টুকরার পাশে ছোট টুকরাগুলোর সন্নিবেশ হিসেবে, দুই রকম টুকরার পরস্পর দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা রূপে– যেন এরা একে অপরকে ঠেলে দিচ্ছে, এমনি নানা বিন্যাস। তবে এগুলোর মধ্যে কোন কোন বিন্যাস চোখে পড়ে বেশি, তাই এদের গুরুত্বও বেশি।

দৃশ্যপটে টুকরা ইত্যাদির বিভিন্ন রকম বিন্যাস

কিছু বিন্যাস রয়েছে যাদেরকে বলা যায় 'নিয়মিত বন্টন'– আকাশে উঠে উপর থেকে সব এক সঙ্গে দেখলে একই উপাদানগুলোকে চারিদিকে নিয়মিত দূরত্বে বার বার দেখা যায়। যেমন পরিকল্পিত শহরতলীতে একটানা দালান, রাস্তা ইত্যাদির মধ্যে প্রায় একই রকম স্কুল-মাঠগুলোকে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর দেখা যাবে কারণ স্কুলের বন্টন হয় পাড়ায় পাড়ায় প্রায় একই ভাবে। বাংলাদেশের অনেক গ্রামে পুকুরগুলোকে এভাবে দেখা যাবে নানা পাড়ায় একটি করে প্রায় একই ভাবে বন্টিত। আবার কিছু বিন্যাসকে 'গুচ্ছ বন্টন' হিসেবে দেখা যায়। যেমন বিস্তীর্ণ জলা বিলের মাঝে মাঝে কিছু উঁচু জায়গায় কৃষিজমির সঙ্গে বসতের পাড়াগুলো গুচ্ছ গ্রাম রূপে থাকে– পুরো বিলের নানা জায়গায় এমন গুচ্ছ বন্টন দেখা যেতে পারে– আমাদের চলন বিলে বর্ষার দৃশ্য যার সঙ্গে মেলে।

'রৈখিক বন্টন' হচ্ছে আর একটি বিন্যাস যেটি সচরাচর রাস্তার দু'পাশের বাড়িঘরের, অথবা মরুময় জায়গায় নদীর দুপাশে গড়ে উঠা কৃষিক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত সরু বিন্যাস হিসেবে দেখা যায়। পরস্পরের মধ্যে ফাঁক দিয়ে দিয়ে সমান্তরাল অনেকগুলো ফালির যে 'সমান্তরাল বন্টন' কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ স্পষ্ট হয় যেমন পাহাড়ে পর পর সমান্তরাল উপত্যকায় নদীগুলোর দু'পাশের সবুজ অঞ্চল, শীত প্রধান উত্তরাঞ্চলে অতীতে হিমবাহের অগ্রগতির ফলে সৃষ্ট সমান্ত-রাল নিম্ন অঞ্চলের জলাভূমিগুলো ইত্যাদি।

কতগুলো বিন্যাসে কয়েকটি উপাদানকে পরস্পর সব সময় এক সঙ্গে থাকতে দেখা যায় সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে। যেমন ধানের চাষের সঙ্গে খাল বা নালার একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে ধানের জমি ও খালকে প্রায়শ এক সঙ্গে দেখা যায়। রাস্তার সঙ্গে সে রকম জনবসতির সম্পর্ক দেখা যায়; তাই তাদের বন্টনও এক সঙ্গে ঘটে। একে বলা হয় 'স্থানিক সম্পর্কগত বন্টন'।

উপর থেকে দেখে এ ধরনের বিন্যাসের একটি মোটামুটি ধারণা লাভ সম্ভব বটে, কিন্তু সত্যিকার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সেটি করতে পেলে রীতিমত পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে। এর একটি উপায় হলো গ্রিড পদ্ধতি। এতে গ্রাফ পেপারের ছকের মত একটি গ্রিড দৃশ্যপটের উপর ধরা হয় (যেমন বিমান থেকে তোলা দৃশ্যপটের ফটোর উপর এটি করা যায়)। এরপর একটি নিরেট পাতে একটি জানালা (ছিদ্র) কেটে তা গ্রিডের

বা দৃশ্যপটের যে কোন স্থানে স্থাপন করা যায়। ঐ জানালার ভেতর দিয়ে গ্রিডের চৌকা এক একটি ছোট ছকের মধ্যে দৃশ্যপটের কোন উপাদান কতগুলো রয়েছে গুণে ফেলা যায়। এবার জানালার সাইজ ক্রমাগত বড় করলে তাতে পুরো জানালার মধ্য দিয়ে একটি উপাদানের মোট সংখ্যা কী ভাবে বাড়ে তা থেকেই বিন্যাসের প্রকৃতি আরো নিখুঁতভাবে উদ্ঘাটিত হয়। যেমন রৈখিক বন্টনের ক্ষেত্রে জানালার সাইজ বড় হলে একদিকে উপাদানের সংখ্যা বাড়তে থাকলেও অন্য দিকে তা বাড়বেনা। বিমান থেকে নেয়া এরিয়াল ফটোগ্রাফের উপর এরকম বিশ্লেষণ চালানো হয় কম্পিউটারের সাহায্যে।

দৃশ্যপটের বিন্যাসে একটি জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো পাশাপাশি দুটি উপাদানের মধ্যে কনট্রাষ্ট বা বৈপরীত্ব। একটি ফটোগ্রাফের মান যখন আমরা পরীক্ষা করি, অথবা টেলিভিশন ছবির মান যদি লক্ষ্য করি, তখন ভাল কনট্রাষ্ট না থাকলে ছবি ফুটেনা। কন্ট্রাষ্ট কম হলে সব কিছু একাকার সাদামাটা হয়ে যায়, উপাদানগুলো আলাদা ভাবে বুঝা যায়না। আবার কনট্রাষ্ট বেশি হলে খুব আলো আর খুব কালো পাশাপাশি থাকায় চোখে লাগে। অনেকটা সেই রকম কনট্রাষ্টের কথা বলা হচ্ছে দৃশ্যপটে পাশাপাশি থাকা উপাদানের মধ্যেও। দৃশ্যপট বিন্যাসে প্রাকৃতিক ভাবে কিছু কনট্রাষ্ট এভাবে সৃষ্টি হয়। কিন্তু যেখানে মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটে– যেমন চাষাবাদ, বন ব্যবস্থাপনা, আবাস নির্মাণ সেখানে সাধারণত কনট্রাষ্ট বৃদ্ধি পায়। টুকরা বা করিডর যদি পার্শ্ববর্তী পটভূমির থেকে খুব ভিন্ন ধরনের হয়, বিশেষ করে পটভূমি যদি অল্প জায়গার মধ্যেই টুকরার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে তা হলে কনষ্ট্রাষ্ট বাড়ে। কিন্তু পটভূমি যদি বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটু একটু বদলে শেষে টুকরার সঙ্গে মিশে যায় তা হলে কনট্রাষ্ট কম হয়। কনট্রাষ্টের সূত্র ধরে কোন দৃশ্যপটে প্রজাতি-বৈচিত্রের পরিবেশ বিবেচনা করা যায়।

খুব স্বল্প কনট্রাষ্টের একটি উদাহরণ হলো উষ্ণ মণ্ডলীয় বাদল বন। উপর থেকে নেয়া এর ছবিতে তো এই বনকে একেবারেই কনট্রাষ্টবিহীন মনে হয়, যদিও কার্যত কিছু কনট্রাষ্ট রয়েছে। উঁচু বৃক্ষের একটানা শামিয়ানা ছবিতে দেখা গেলেও এতে অনুচ্চ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এ সব রয়েছে, আছে মাঝে মাঝে ছোট ফাঁকা জায়গা, ছোট নদী ইত্যাদিও– তবে মোটের উপর উপাদানগুলোর মধ্যে কনটাষ্ট্র খুব কম। নিম্ন কনষ্ট্রাষ্টের

প্রভাব শুধু উপর থেকে ভাসা ভাসা যা দেখা যায় তাতে সীমাবদ্ধ নয়– বরং এখানকার জীব বাসিন্দাদের জন্য এটি ইতিবাচক ব্যাপার। কনট্রাষ্ট না থাকার একটি মানে হলো এখানে ক্ষুদ্র- জলবায়ু সব সময় সারা বছর একই থাকে। উদ্ভিদভোজীরা– বিশেষ করে ফলভোজীরা– সারা বছর একই বিচিত্র ফল ও অন্যান্য উদ্ভিজ খাদ্যের উপর নির্ভর করতে পারে। আবার এই পাখি, স্তন্যপায়ী, পতঙ্গ বাসিন্দারাই ঐ ফলগুলোর বীজ প্রায় সমানভাবে সারা বনে ছড়িয়ে দিয়ে বনের নিরবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করে। কনট্রাষ্ট কম হবার মানে কিন্তু এই নয় যে বনের মধ্যে জটিলতা নেই – বরং এর নানা অংশে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে অসংখ্য পৃথক ভূবন যার ফলে বাদল বন পরিণত হতে পেরেছে সব চেয়ে বড় আকরগুলোর একটি।

উচ্চ কনট্রাষ্টে পটভূমিও প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হতে পারে– সে ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুটি ভূমির আর্দ্রতায় ও উর্বরতায় বড় ধরনের পার্থক্য থাকে। ভূমির এই গুণাগুণের উপর এক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণি খুবই সংবেদনশীল ভাবে নির্ভর করে। তুলনামূলক ভাবে শুষ্ক এলাকায় তৃণভূমি ও বৃক্ষবনের সংযোগ স্থলে এমনটি ঘটার ফলে উচ্চ কনট্রাষ্ট আমরা লক্ষ্য করি। দক্ষিণ আফ্রিকায়, আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে, অষ্ট্রেলিয়ায় এমনটি প্রচুর দেখা যায়। তেমনি সাইবেরিয়াতে অথবা সুইডেন ও নরওয়েতে পীট সমৃদ্ধ জলাভূমির সংলগ্ন বনে এ ধরনের উচ্চ কনট্রাষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এ রকম ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক মিটার দূরত্বের মধ্যেই বন নাটকীয় ভাবে শেষ হয়ে তৃণভূমি শুরু হয়, অথবা পীট সমৃদ্ধ জলা শুরু হয়– যার জন্য কনট্রাষ্ট উচ্চ হয়। মানুষের হস্তক্ষেপের কারণেও পটভূমিতে এরকম উচ্চ কনট্রাষ্ট অহরহ ঘটছে। মরুময় জায়গায় একটি কূপ খননের কারণে তার চারিদিকে যখন গাছপালা ও বসত গড়ে ওঠে তখন বালিময় ধূ ধূ মরু একটি জায়গায় এসে হঠাৎ করে সবুজ গাছপালা আর ঘরবাড়িতে পর্য্যবেশিত হয়ে উচ্চ কনট্রাষ্ট দেখা দেয়। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যেখানে ইতোমধ্যেই উপাদানগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক ভাবে বৈপরীত্য রয়েছে মানুষের হস্তক্ষেপে উচ্চ কন্ট্রাষ্ট সেখানেই হয়। বৈপরীত্যগুলো স্থানীয় জীববৈচিত্রকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এটিই সেখানে স্বাভাবিক। সাধারণ ভাবে পটভূমির উপর মানুষের বড় হস্তক্ষেপ সব সময় এরকম তীব্র বৈপরীত্ব সৃষ্টি করে জীববৈচিত্রে বিঘ্ন ঘটায়।

দৃশ্যপটের গড়ে ওঠা

ভূমি-রূপ

দৃশ্যপটের গড়ে ওঠার কাহিনী যদি অনুসরণ করতে চাই তা হলে যে ক'টা জিনিসের দিকে তাকাতে হবে তার মধ্যে একটি হলো ভূমি-রূপ – সমতল ভূমি, পাহাড়ি ভূমি, উপত্যাকা, গিরিখাত, উচ্চ পর্বত এরকম কত রকমের ভূমি-রূপই তো নানা দৃশ্যপটে দেখা যায়। এর সবগুলোরই গড়ে ওঠার পেছনে চারটি প্রধান প্রক্রিয়ার কোন না কোনটি জড়িত থাকে– প্লেইট টেকটোনিক, ভূমি অবক্ষয়, বস্তুসঞ্চয়, হিমবাহ।

প্লেইট টেকটোনিক হলো ভূত্বক সম্পর্কে সর্বাধুনিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে ভূত্বক কয়েকটি প্লেইট বা পাতে বিভক্ত রয়েছে এবং ঠিক নিচের গলিত লাভার উপর ভেসে থেকে সেগুলো ক্রমে সরে যাচ্ছে। এভাবে এরা পরস্পরের দিকে গিয়ে সংলগ্ন হলে সংযোগস্থলে নানা ঘটনা ঘটাচ্ছে। প্লেটগুলোর কিনারায় পরস্পরের সংযোগ স্থলে

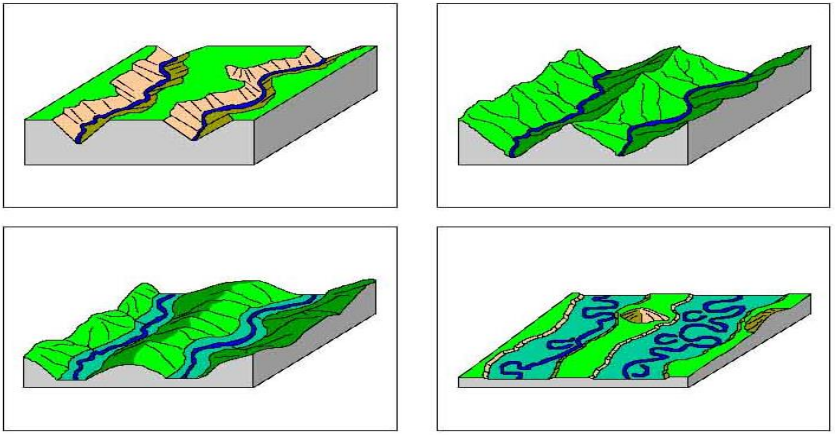

জলস্রোতের ফলে অবক্ষয় ও বস্তু সঞ্চয় দৃশ্যপটকে ক্রমাগত সমতল হবার দিকে নিয়ে গেছে

একের উপর অন্যের চাপ, ভূ-অভ্যন্তর থেকে গলিত শিলার উর্দ্ধমুখিনতা, অথবা একটির কিনারা অন্যটির তলা দিয়ে নিচে চলে যাওয়া– ইত্যাদির ফলেই সৃষ্টি হয়

পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প ইত্যাদি। – ভূমি অবক্ষয় ও বস্তু সঞ্চয়– পরের প্রক্রিয়া দুটিকে এর দেখা যাক। বায়ুপ্রবাহ, পানি প্রবাহ ইত্যাদির ফলে যে অবক্ষয় ঘটে তা দিনের পর দিন ভূমিকে অবক্ষয়িত করে এবং তাতে শেষ পর্যন্ত বড় রকমের পরিবর্তন ঘটিয়ে আজকের ভূমি-রূপ এনে দিয়েছে। অবক্ষয়িত অংশগুলো ঐ বায়ু বা পানি প্রবাহের সঙ্গেই বাহিত হয়ে নিচু জায়গাগুলোতে জমতে থাকে। অবক্ষয় এবং এই বস্তু সঞ্চয় এই দুইয়ের মিলিত ফলশ্রুতি হলো দৃশ্যপটকে ক্রমাগত সমতল হবার দিকে নিয়ে যাওয়া। কাজেই যে সব জায়গায় খাড়া পাহাড়ী ঢাল এবং চড়াই-উৎরাই দেখা যায় সেগুলোকে লক্ষ লক্ষ বছরের ভূতাত্ত্বিক সময়ের হিসাবে অপেক্ষাকৃত নবীন মনে করা যায়– যা এখনো সমতল হবার সময় পায়নি। অন্যদিকে অতীতে বিভিন্ন হিমযুগে জগদ্দল বরফের অতি ধীর গতির হিমবাহগুলো মেরু অঞ্চল থেকে এগিয়ে বিষুব রেখার অনেক কাছে চলে এসেছিল। এসময় এখানে বরফের এই বিশাল স্তূপের প্রবাহের চাপে ভূমিতে অনেক উঁচু নীচু জায়গা সৃষ্টি হয়েছে; বরফের দ্বারা প্রচুর শিলা স্থানান্তরের ফলে বরফ সরে যাওয়ার পর তার ফেলে যাওয়া শিলার দ্বারা দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটেছে।

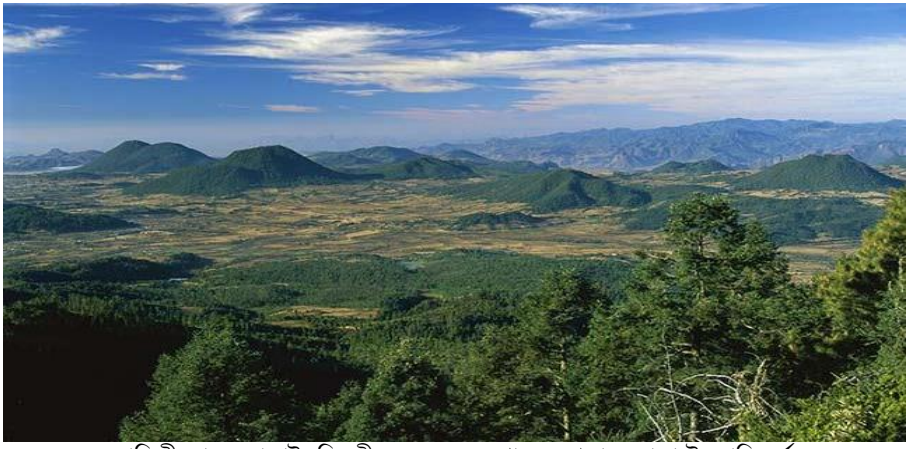

নাতিশীতোষ্ণ দৃশ্যপট: নিরক্ষীয় অঞ্চলের সুগোল মসৃণতার দৃশ্যপটের পরিবর্তে এখানে এসেছে কিছুটা কৌণিকতার ভাব

ভূমিরূপ গড়ার সবরকম প্রক্রিয়াই কীভাবে কতখানি কার্যকর হবে তা জলবায়ুর উপরও অনেকটা নির্ভর করে। কতগুলো বিশেষ জলবায়ু রূপ এতে বিশেষ অবদান রাখে।

যেমন নিরক্ষীয় জলবায়ুতে সর্বদা উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া ভূমিকে সবুজে আচ্ছাদিত করে রাখে– বনাঞ্চলের বৃক্ষ-সুসমতায় ঢাকা গড়ে যায় সব এবড়ো খেবড়ো ভাবে। প্রচুর বৃষ্টির পানির অধিকাংশটাই এখানে উদ্ভিদ শুষে নেয়, তারপরও বাকিটা গড়িয়ে গিয়ে প্রথমে ছোট নদী এবং পরে বড় নদী সৃষ্টি করে। এসব নদী এ অঞ্চলের পটভূমির একমাত্র কনট্রাষ্ট।

আর্কটিকের শীতল মরু

বিষূব রেখা থেকে উষ্ণ মণ্ডলের উপর দিয়ে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে এগুলো এক পর্যায়ে একটানা বন শেষ হয়ে বন, তৃণভূমি, কৃষিজমির মিশ্রণই উচ্চকিত হয়ে উঠে। নিরক্ষ রেখা থেকে যত দূরে এভাবে যাব তত আর্দ্রতা কমবে, যার ফলে উদ্ভিদরাজি হবে তত বেশি ফাঁকা ফাঁকা, ফলে সেখানকার মাটি পানির দ্বারা অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পায় তত কম। ওদিকে বৃষ্টিও আর সেখানে সারা বছর হয়না, বরং সব বৃষ্টি কয়েক মাসের বর্ষাতেই কেন্দ্রীভূত হয় এবং ভূমিকে প্রচুর অবক্ষয় করতে পারে। এর ভারি পলি বৃষ্টির দিন শেষ হয়ে যাওয়ার আগে বেশি দূরে সরে যেতে পারেনা। ফলে বছর বছর এ ভাবে সৃষ্টি হয় ভূমির বেশ ঢালু কিনারা। তাছাড়া শক্ত শিলা যা অবক্ষয়িত হয়না তা জেগে থোকে আশ পাশের ভূমির উপর। এজন্য নিরক্ষীয় অঞ্চল বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে দৃশ্যপট নিটোল সুগোল থাকলেও এখান থেকে যত বেশি দূরে উষ্ণ বা

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যাবে তা ক্রমে বেশি বেশি কৌণিক গঠনের দৃশ্যপট হয়ে উঠে যেখানে নিটোল মসৃণতার বদলে যেন সবকিছুর কোণা-কানা বেরিয়ে থাকে। উদ্ভিদের রীতিমত অভাব দেখা দেয় মরু অঞ্চলগুলোতে, আর তাই সেখানে টুকরার বিচিত্রতা দেখা যায়, কনট্রাষ্ট বেশি হয়। এ শুধু বালির মরুতে নয়, বরং শিলাময় মরু, শীতল মরু, পাহাড়ি মরু সবটাতেই। এর কোন কোনটাতে বায়ু প্রবাহের ফলে যে অবক্ষয় হয় তাতে শিলাতে নানা রকম অদ্ভূত আকৃতি সৃষ্টি হয় যেমন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমের মরুতে, আবার কোথাও লবণ-হ্রদের সৃষ্টি হয় অথবা লবণ-ঢাকা সমতলের– যেমন যুক্তরাষ্ট্রের উতাহতে। মেরু অঞ্চলে শীতল জলবায়ুতে পাথরের সূক্ষ্ম ফাটলে বরফ জমে। পানি বরফ হবার সময় তার প্রসারণের চাপে পাথর ফেটে অসংখ্য কোণ-আকীর্ণ পাহাড়ে পরিণত হয় যা আবার একই প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে অবক্ষয়িত হয়– ফলে সময়ের সঙ্গে এখানে ভূমির উপরিভাগ এক ধরনের মসৃণতা লাভ করে। ক্রমান্বয়ে বার বার ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে এবং উষ্ণ হয়ে সংকোচন-প্রসারণের টানাপোড়েন হয়ে খন্ড খন্ড হয়ে এখানকার মাটিও তেমন কোন আকৃতি গড়ে তুলতে পারেনা। শুধু উচ্চ পর্বত অঞ্চলে হিমবাহের কাজের দ্বারা প্রশস্ত উপত্যাকা সৃষ্টি হয়ে সিড়ির ধাপের মত কিছু অনিয়মিত ধাপ সৃষ্টি করে। হিমবাহ প্রচুর হ্রদও সৃষ্টি করে এসব জায়গায়। আজ আমরা যে দৃশ্যপট সেখানে দেখছি তা বর্তমানের এবং অতীতের জলবায়ুর প্রভাবেই গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। অবশ্য একথা শুধু দৃশ্যপটের প্রকৃতি-সৃষ্ট অংশ সম্পর্কেই বলা চলে, মানুষ-সৃষ্ট অংশ সম্পর্কে নয়।

দীর্ঘকাল ধরে বায়ু প্রবাহের দ্বারা অবক্ষয়ে শিলার অদ্ভূত আকৃতি

জীব প্রজাতিগুলোর গড়ে ওঠা

নানা দৃশ্যপটে উদ্ভিদগুলোই শেষ পর্যন্ত দৃশ্যের অনেকখানি সৃষ্টি করে, তার অভ্যন্তরের অনেক কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রাণি বৈচিত্রকে সহ। প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে ভূতাত্ত্বিক টারশিয়ারি যুগের অবসানের পর বিচ্ছিন্ন সব মহাদেশগুলোতে আলাদা আলাদা ভাবে আজকের নানা উদ্ভিদ গোষ্ঠি যার যার মত গড়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ তারও অনেক আগে মহাদেশগুলো যখন পরস্পর সংলগ্ন ছিল তখন সম্মিলিত নিরক্ষীয় অঞ্চল জুড়ে রেইন ফরেষ্টে আজকের ওখানকার বৃক্ষগুলোর পূর্বসূরিরা গড়ে উঠেছিল। পৃথক হবার পর এশীয়, আফ্রিকান, ও দক্ষিণ আমেরিকান রেইন ফরেষ্টের উদ্ভিদে পরিবর্তন এলেও মূলত এগুলো একই রয়ে গেছে। সর্বশেষ হিমযুগের সময় মেরু অঞ্চল থেকে এগিয়ে আসা হিমবাহ, এবং আজ থেকে প্রায় ১২ হাজার বছর আগে হিমযুগের অবসান, মোটামুটি ঠিক করে দিয়েছে আজকের দুনিয়ার কোথায় উদ্ভিদের কোন প্রজাতিগুলো বিকশিত হবে।

বিশেষ বিশেষ দৃশ্যপটে কী কী ধরনের প্রজাতি বৈচিত্র গড়ে উঠতে পারে সেটি দেখতে কয়েকটি বিষয়ের দিকে তাকাতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে বুঝা যায় যে দৃশ্যপটের মধ্যে প্রাণির সম্পর্কে জানাটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, উদ্ভিদের চেয়ে বেশি। প্রথমত বুঝতে হবে যে প্রাণিরা উদ্ভিদের চেয়ে অনেক কম সময়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেই প্রাণির যদি দেশান্তরী হয়ে বিচরণের গুণ থাকে তা হলে এটি আরো দ্রুত ঘটতে পারে। আমাদের দেশে অতিথি পাখিগুলো শীতকালে উত্তরের শীতপ্রধান থেকে আসে, কিন্তু আবার গ্রীষ্মে আগের জায়গায় ফেরৎ যার। এর মানে এরা কিন্তু একই রকম পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে, পরিবেশ সরে গেলে তারাও সরে যায়। কোথাও যদি জলবায়ু ও পরিবেশ স্থায়ীভাবে বদলে যায় তা হলে সেখান থেকে পুরানো প্রজাতি স্থায়ীভাবে যেমন চলে যেতে পারে, বিলুপ্তও হতে পারে, তেমনি নূতন ধরনের প্রজাতি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত মনে রাখতে হবে যে বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রাণির উপর খুবই কার্যকর, উদ্ভিদের চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই যখন কোন প্রজাতির একটি দল একটি নূতন পরিবেশে পতিত হয় তখন প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাদের মধ্যে যথাযথ ভাবে খাপখাওয়ানো বৈশিষ্টধারীরাই দ্রুত কিছু প্রজন্মের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে, বাকিরা

টিকে থাকেনা। ফলে প্রজাতিটির দলটির মধ্যে বৈচিত্র কমে যায় – তারা সবাই একে অপরের মত হয়ে উঠে।

তৃতীয়ত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণি প্রজাতির একটি ফীডব্যাক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ প্রথমটি দ্বিতীয়টির মধ্যে যে পরিবর্তন আনে, সেই পরিবর্তনই আবার ফিরে গিয়ে প্রথমটিকে প্রভাবিত করে। জলবায়ু, উদ্ভিদ এবং মাটি যেভাবে প্রাণির প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে, ঐ পারিবেশিক বিষয়গুলো তেমনি আবার প্রাণির দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন প্রাণি উদ্ভিদ খেয়ে তাকে সীমিত করতে পারে, পরগায়নের মাধ্যমে উদ্ভিদকে বংশবিস্তারে সহায়তা দিতে পারে, একই ভাবে বীজ স্থানান্তরের মাধ্যমে উদ্ভিদের বিস্তার ঘটতে পারে। এই ফীডব্যাকগুলো উদ্ভিদ আর প্রাণির ভারসাম্য রক্ষা করে – সে ক্ষেত্রে মানুষের হস্তক্ষেপ আবার বড় পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

ঐ তিনটি বিষয়ই দেখিয়ে দিচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে ওখানে কী রকম প্রাণি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেই তথ্যটি কোন দৃশ্যপটের গুণাগুণের বেশ সূক্ষ্ম নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। দৃশ্যপট কী ভাবে গড়ে উঠছে তা বুঝতে চাইলে বুঝতে হবে তার অভ্যন্তরে কী রকম প্রাণি বাস করছে।

এখন কোন দৃশ্যপটে আমরা একটি প্রাণি প্রজাতি দেখে প্রশ্ন করতে পারি এই প্রজাতিটা শুরুতে আলাদা প্রজাতি হিসেবে দেখা দিল কী করে? বিবর্তন তত্ত্বে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে– নূতন প্রজাতি সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন নিয়েই তো বিবর্তন তত্ত্ব। এ সম্পর্কে ডারউইনের যুগান্তকারী বইয়ের নামটিও ছিল "প্রজাতির উদ্ভব" (অরিজিন অব স্পেসিস)। একটি প্রজাতি কী ভাবে কালক্রমে একাধিক নূতন প্রজাতিতে বিবর্তিত হতে পারে সেই ব্যাখ্যা এতে রয়েছে। মূল প্রজাতির কোন গোষ্ঠি যখন বিভিন্ন পৃথক রকমের পরিবেশ পরিবর্তনের সম্মূখীন হয় এবং এই দুই গোষ্ঠির মধ্যে প্রাকৃতিক বাধার কারণে যোগাযোগ আর থাকেনা, এখন যার যার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে তাদের নানা গুণাগুন বিভিন্ন দিকে বিবর্তিত হয়। অথচ প্রজননগত মিলনের সুযোগ না থাকায় জিন সংমিশ্রণের মাধ্যমে পার্থক্যগুলোর কার্যকারিতা মিইয়ে যেতে পারেনা। ফলে বহু প্রজন্ম পর এরা এত ভিন্ন হয়ে গড়ে যে

পরে কাছাকাছি এলেও এরা আর পরস্পরের সঙ্গে প্রজনন করতে পারেনা, এবং তাই পৃথক প্রজাতি হিসেবে গণ্য হয়।

পুরো ভিন্ন প্রজাতি হবার আগে এরা একই প্রজাতির উপপ্রজাতি হিসেবেও বহুদিন পৃথক থাকতে পারে। ডারউইন নিজে লক্ষ্য করেছেন কী ভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ গ্যালাপাগোসে অসংখ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের প্রত্যেকটিতে একই রকম চড়ুই যথেষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ঠোঁটের অধিকারী হয়েছে এবং সম্পূর্ণ পৃথক প্রজাতি হয়ে গেছে। তিনি এর থেকেই অনুমান করেছিলেন যে মূল ভূখণ্ড থেকে এক সময় এই চড়ুইদের একই প্রজাতি এই সব নানা দ্বীপে এসেছিল। কিন্তু পরিবেশের কারণে এতে চড়ুইয়ের সম্ভাব্য খাদ্য এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে এত ভিন্ন যে যার যারটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে তাদের ঠোটের বিবর্তন হয়েছে, হয়তো অন্য গুণাগুণেরও – যার ফলে এরা পৃথক প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। সে সব দ্বীপে আজকাল এই চড়ুইয়ের অনেক প্রজাতি।

উত্তর আমেরিকার খুব শীতল উত্তরাংশে পূর্বে আলাস্কা, ও পশ্চিমে কানাডার নিউফাউণ্ডল্যান্ড পর্যন্ত পুরো জায়গায় নানা রকম বল্গা হরিণ জাতীয় বিশাল প্রাণি মুজ রয়েছে। এগুলো সেখানকার মৃদু গ্রীষ্মে জলজ উদ্ভিদ খায় আর শীতে গাছের কচি ডাল। সর্বশেষ হিমযুগের আগে ঐ পুরো জায়গায় মুজের একটিই প্রজাতি ছিল। কিন্তু হিমযুগে ভারী বরফ মেরু থেকে দক্ষিণেও বিস্তৃত হলে এরা পরস্পর থেকে দূরে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ দূরে চারটি জায়গায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পুরো দীর্ঘ হিমযুগে সেভাবেই থাকে। দশ হাজার বছর আগে হিমযুগের অবসানে এরা আবার সর্বত্র বিচরণ করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু ইতোমধ্যে চারটি জায়গার মুজ চারটি ভিন্ন উপপ্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। প্রায় একই ভাবে অতীতে এক সময়ে একই বাঘ রূপে থাকলেও সাইবেরিয়ার বাঘ ও আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ভিন্ন পরিবেশে বিবর্তনের কারণে এখন বাঘের দুটি ভিন্ন উপ-প্রজাতি।

ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, উচ্চ কনট্রাষ্টের ক্ষেত্রে কোন দৃশ্যপটে অধিক প্রজাতি বৈচিত্র সৃষ্টি হতে পারে। ভূবন বৈশিষ্টের সঙ্গে যে প্রজাতি বৈচিত্রের সম্পর্ক রয়েছে তা তো আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। উচ্চ কনট্রাষ্টের ক্ষেত্রে এর একটি উদাহরণ নেয়া যাক। উচ্চ পর্বতের গায়ে অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গাগুলোতেও শীতে বরফ জমে থাকে। পর্বতের

গায়ে অন্য এলাকাগুলোর সঙ্গে এর কনট্রাষ্ট লক্ষণীয়। বসন্তে ধীরে বরফ গলা আরম্ভ হলে এর কিনারার প্রথম বরফমুক্ত জায়গাগুলোতে আলো উত্তাপ, পানি এখানকার উদ্ভিজকে দ্রুত বাড়ায় ও ফুল ফোটাবার সুযোগ দেয়। কিন্তু তখনো বরফে ঢাকা ভেতরের জায়গাগুলোতে উদ্ভিদ আসতে পারে আরো বেশ কিছু দেরিতে, সেখানকার বরফও গলার পর। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ফুল আসে বলে উভয়ের মধ্যে পরাগ সংযোগ সম্ভব হয়না। এভাবে তারা কালক্রমে ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। কাজেই পর্বতের একটু বেশি নিচের এলাকার উদ্ভিদ তার একটু উপরের উদ্ভিদের থেকে ভিন্ন; এভাবে পরিবেশের উচ্চ কনট্রাস্ট প্রজাতি বৈচিত্রের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু অন্যত্র এরকম উচ্চ কনট্রাষ্টের পরিবেশ ছাড়াই খুব সূক্ষ্ম আকারে প্রচুর পৃথক পৃথক ভূবনের সৃষ্টি হতে পারে – যেমন রেইন ফরেষ্ট বা বাদল বনে দৃশ্যপটের কনট্রাষ্ট কম। অথচ সেখানে মাটিতে গর্ত থেকে শুরু করে লতা, গুল্ম, বৃহৎ বৃক্ষের কাণ্ড, তার খোপখাপ, বাকল, শাখা, মগডালে পাতায় ছাওয়া শামিয়ানা ইত্যাদি সব কিছুতে অসংখ্য ভূবন অসংখ্য প্রজতির সৃষ্টি করেছে– কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে পাখি, সরীসৃপ, মাটিতে বিচরণকারী স্তন্যপায়ী, গাছের স্তন্যপায়ী, কত কি। এক্ষেত্রে বরং যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তনীয় জলবায়ু ও সামগ্রিক ভাবে একই প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্য জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায়, নানা ভূবন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজাতি বৈচিত্রের সহায়কই হয়েছে।

একটি কথা স্পষ্ট, তা হলো দৃশ্যপটে জলবায়ু আর ভূমি-রূপই প্রজাতি বৈচিত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোটি তৈরি করে দেয়। এগুলো যেন নাটকের মঞ্চটি গড়ে দেয় আর তাতে অভিনেতারা হলো প্রজাতিগুলো। আর এই নাটক যে শুধু আজ এখন অভিনীত হচ্ছে তা নয়। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে এই নিরবিচ্ছিন্ন নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে। এতে দৃশ্য বদলিয়েছে, অভিনেতাদেরও পরিবর্তন এসেছে কিন্তু তার গল্পের একটি ধারাবাহিকতা আছে– সেটি জীব বিবর্তনের গল্প।

বিপর্যয়ের প্রভাব

বৈচিত্রে এবং ব্যাপকতা দৃশ্যপটের গড়ে উঠার উপর মানুষ-সৃষ্ট বিপর্যয়গুলোই এখন বেশি বেশি প্রভাব রাখছে। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আগুণ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত– এগুলোই হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলোর

মধ্যে প্রধান। আগুণ, বন্যা অথবা আগ্নেয়গিরি কোন কোন জায়গায় এত ঘন ঘন ঘটে যে তাকে আর বিপর্যয় বলেই গণ্য করা যায়না। ওখানকার দৃশ্যপটে জীব প্রজাতিগুলো এসবের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়েই বিবর্তিত হয়, তাই এ পর্যন্ত আমরা যে সব নিয়ামকের কথা আলোচনা করেছি সেগুলোর মতই স্বাভাবিক ভাবে এরা দৃশ্যপটকে গড়ে তোলে। কিন্তু যেখানে হঠাৎ হঠাৎ অনিয়মিত ভাবে এগুলো ঘটে, অথবা বড় অন্য কোন দুর্যোগ আসে– যেমন বড় রকম রোগবালাই মহামারীরূপে–

দৃশ্যপটের বিপর্যয়

তখন নূতন করে দৃশ্যপটে উচ্চ কনট্রাষ্ট যোগ হয়, টুকরাগুলোর সমসত্ত্বতা অনেক কমে যায়। যেমন যেই বন খুবই সমসত্ত্ব ছিল ঝড়ে গাছ পড়ে গিয়ে তার মধ্যে হঠাৎ বহু ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি হয়। একই রকম ঘটনা বন্যা বা আগুণের ফলেও ঘটতে পারে।

তবে মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয়গুলোই হবে এখানে আমাদের প্রধানা বিবেচ্য– যেগুলোকে কয়েকটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখবো। একটি হলো প্রকৃতির যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে মানুষ তাতে বাধ সাধে, নিজের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। যেমন দৈনিক উত্তাপ বাড়া কমার

যে ছন্দ প্রকৃতিতে আছে, আমরা কোথাও কোথাও ব্যাপক হারে গ্রীন হাউজে চাষের মাধ্যমে তার মধ্যে পরিবর্তন আনি। এখানে উচ্চতর উত্তাপে ভিন্ন রকম উদ্ভিদ বাড়তে পারে – দৃশ্যপটে পরিবর্তন আসে। তবে দৈনিক ছন্দের বিপর্যয় তত ব্যাপক হয়না যা হয় মৌসুমী ছন্দের বিপর্যয়ে। যখন থেকে মানুষ শিকারি সংগ্রাহক হিসেবে জীবন ধারনের বদলে কৃষির মাধ্যমে তা করেছে (এখন থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে থেকে) প্রাকৃতিক এই ছন্দ আমরা নিয়মিত বিপর্যস্ত করেছি। চাষবাসের সবগুলো অংশ– ভূমিকর্ষণ, পানি সেচ, শস্য রোপন, তৃণভূমিতে পশু চারণ সবই মৌসুমী ছন্দে বিপর্যয় ঘটিয়ে ভিন্ন ধরনের দৃশ্যপট গড়ে তুলেছে। ব্যাপক ভূমিকে কৃষির আওতায় আনা, বাঁধ দিয়ে ব্যাপক সেচের ব্যবস্থা করা, ব্যাপক পশুচারণ করা– এসব যে কত বড় বড় বিপর্যয় ঘটাতে পারে তার নমুনা পৃথিবীতে প্রচুর। আর এগুলো শুধু মৌসুমী হস্তক্ষেপ আর থাকেনি বরং বহু বছরের নিয়মিত ছন্দ ভেঙ্গে দিয়ে মানুষ দৃশ্যপটে বহু বার্ষিক বিপর্যয় এনেছে। যেমন অতীতকাল থেকে অনেক বনাঞ্চলেই মানুষ ঝুম চাষ করেছে যাতে কয়েক বছর পর পর বনের এক এক অংশ সম্পূর্ণ পুড়ে খালি করেছে।

দাবানল অথবা জুম চাষের আগুণ দৃশ্যপটে বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে

এ ধরনের বিপর্যয় ঘটানোর প্রভাব স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির উপর পড়েছে, প্রজাতি বৈশিষ্টের ধরনই বদলে গেছে– দৈনিক, মৌসুমী বা বহু বার্ষিক ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ছন্দে বিপর্যয় এনে।

কৃষি ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে পদ্ধতিগুলোর যে পরিবর্তন যুগে যুগে মানুষ এনেছে তাও বিপর্যয় ঘটিয়ে দৃশ্যপট গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রভাব রেখেছে। উদাহরণ স্বরূপ পশুটানা লাঙ্গলের বদলে ট্রাক্টর দিয়ে মানুষ যখন চাষ শুরু করলো তখন ভূমির উপর শক্তি প্রয়োগের হার বেড়ে গেল প্রায় শত গুণ– যা দৃশ্যপটে বড় রকম অপরিবর্তনীয় ছাপ রাখতে বেশি সহায়ক হয়েছে। উন্নত কৃষি আসার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক জমিকে সব সময় কয়েক মৌসুমের জন্য পতিত রাখার যে রীতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ চালু করেছিল সেটি ধীরে ধীরে উঠে গেল। ফলে কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণি যে ওসব জমিতে অস্থায়ী ভাবে হলেও যে ফিরে এসে টিকে থাকতো তার উপায় রইলোনা। তাছাড়া একটানা শস্য চাষের ফলে ভূমির উর্বরতার যে অবক্ষয় হয় তার ক্ষতিপূরণ না হতে পেরে ইকোসিষ্টেমে স্থায়ী পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক প্রয়োগ একই কাজ করেছে। কৃষিজমি, চারণভূমি, বন ব্যবস্থাপনা, পর্বত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির আওতায় মানুষ এখন ব্যাপক ভাবে দৃশ্যপটে হস্তক্ষেপ করছে,

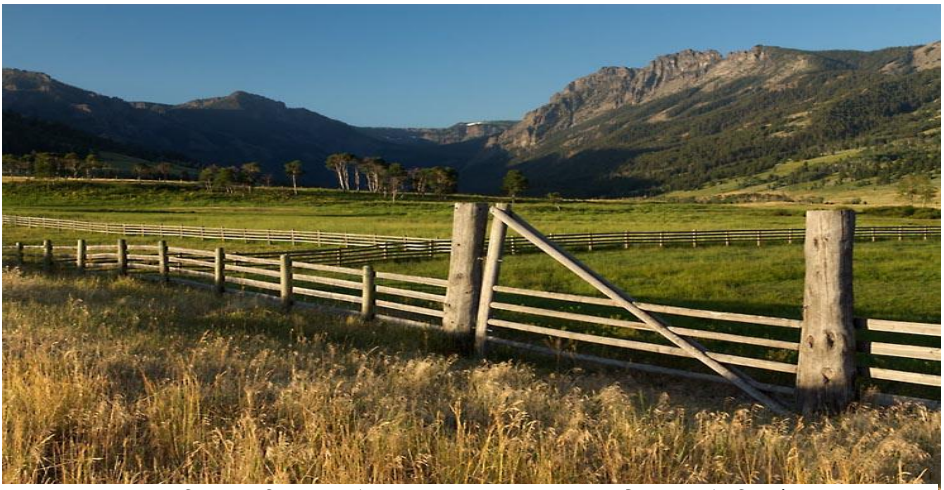

ঘেরা বেড়া দিয়ে প্রকৃতিক দৃশ্যপটকে ভাগ করে কাজে লাগানোটিও দৃশ্যপট বিপর্যয় বৈ নয়

এর পরিবর্তন সাধন করছে। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে, কখনো কখনো মনোরম দৃশ্য সৃষ্টির জন্য মানুষ এসব করে থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক জীববৈচিত্রের কাছে এর ফলাফল দাঁড়ায় অনেক ক্ষেত্রেই বিপর্যয় হিসেবে।

কী এই ব্যবস্থাপনা? বন থেকে নিয়মিত বৃক্ষ সম্পদ আহরণের জন্য হয়তো আমরা বনের একদিক নিয়মিত কেটে ফেলছি, অথবা হয়তো পরিপক্ক বেশি বয়সের গাছগুলোকে বেছে বেছে কাটছি; তাতে হয়তো বন ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ভালই করছি– কিন্তু দৃশ্যপট অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে নয়। লোকালয় সৃষ্টি, চাষের জমি সৃষ্টি ইত্যাদি মানুষ ক্রমাগত করে যাচ্ছে– বনাঞ্চল, তৃণভূমি ইত্যাদিকে বিপর্যস্ত করে। আমরা যদি পৃথিবীর নানা অঞ্চলের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাই– তা হলে এ ধরনের ব্যবস্থাপনার নানা চিত্র দেখতে পাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে এসব চিত্র ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ইউরোপে বন কেটে যখন কৃষিজমি বা চারণভূমি সৃষ্টি হলো– প্রথম দিকে তার মালিকানা থাকতো পুরো গ্রাম সমাজের, তাই জমিকে ভাগ করার দরকার ছিলনা। পরে সামন্ততন্ত্র এলো, বড় ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত মালিকানা এলো; তখন বিস্তীর্ণ জমিকে বিভক্ত হলো ঝোপ সারির মাধ্যমে। সে অবস্থা দীর্ঘদিন চল্লেও পরে যান্ত্রিক কৃষি যুগে এসে ঝোপ সারি অপসারিত হলো। এই পরিবর্তনগুলো জীববৈচিত্রের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এখনো ঘটাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় দেখা গেছে একই জমি মানুষ পাঁচ হাজার বছর ধরে চাষ করে যাচ্ছে বিশেষ কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে – চীনে এবং ইউক্রেনে এরকম বহু নমুনা রয়েছে। এখানে ভূমি-উর্বরতা ইত্যাদি স্থিতিশীল ছিল বলেই এটি সম্ভব হয়েছে– পরিবেশের একরকম ভারসাম্য দীর্ঘদিন এভাবে বজায় ছিল। আবার অন্যত্র দেখা গেছে যে অঞ্চলের জমিকে এক সময় 'সোনা ফলানো' বা দেশের 'শস্য গোলা' হিসেবে অভিহিত করা হতো, সেটিই পরে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে নিষ্ফলা হয়ে গেছে। উত্তর আফ্রিকার নুমিদিয়া অঞ্চলের মরুভূমি এবং ইসরাইলের মরুভূমি কয়েক হাজার বছর আগেও শস্য শ্যামলা ছিল এবং ঘন বসতিপূর্ণ বর্ধিষ্ণু অঞ্চল ছিল। দৃশ্য- পটের এসব বড় রকম পরিবর্তন মানুষের হস্তক্ষেপেই ঘটেছে– এর মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল এক সময় সমৃদ্ধ তৃণভূমি ছিল। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক সময়ে তা গুরুতর বিপর্যয়ে পতিত হয়েছে।

দৃশ্যপটে মানুষের হস্তক্ষেপের সব চেয়ে জ্বলজলে বিষয় হলো লোকালয় নির্মাণ– গ্রাম, শহর, মহানগর ইত্যাদি। টানা কৃষিজমি বা অন্যান্য নানা পটভূমিতে এখানে ওখানে যখন গ্রাম গড়ে ওঠে তখন এ জায়গার টুকরা সংখ্যা যেমন বেড়ে যায়, তেমনি বাড়ে করিডরের সংখ্যাও– কারণ গ্রামগুলোা সাধারণত রাস্তা, ঝোপ সারি ইত্যাদি দিয়ে যুক্ত থাকে। যে সব দেশে গ্রামীণ পরিবেশ দীর্ঘ দিন ধরে সংরক্ষিত সেখানে শত শত বছর ধরে প্রায় একই রকম বিন্যাসে গ্রামের দৃশ্যপট বজায় থাকে; উন্নত দেশের মধ্যেও এমনটি দেখা যায় সুইজারল্যাণ্ড যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম এলাকা উত্তর আফ্রিকার নুমিদিয়া অঞ্চলেও এটি খুব স্পষ্ট। অন্যত্র অবশ্য মানুষের হস্তক্ষেপে গ্রামের পরিবর্তন ঘটেছে, বিলুপ্তিও ঘটেছে। তা ছাড়া নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগেও তা ঘটে। কিছু জীব প্রজাতির আগমণ ও বৃদ্ধি গ্রামের বড় লোকালয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য– তা দুনিয়ার দেশে দেশেই। বাড়িতে উপদ্রবকারী ইঁদুর, মাছি; উদ্ভিদের মধ্যে জলবায়ু ভেদে কলা, কিছু কিছু বিশেষ গুল্ম যেমন ঘাসফুল এসবকে খাস করে গ্রাম-প্রজাতিই বলা যায়– কারণ গ্রামের বাইরে তৃণভূমিতে, বা উন্নত নগরে এদের খুব একটা দেখা মেলেনা। বর্তমান নগরায়নের আধিক্যের যুগে

নগরের সঙ্গে গড়ে উঠেছে তার কিনারায় কিছু গ্রামীণ পরিবেশের শহরতলী। বড় নগরীতে কাজ করার মানুষ এখানে বেশি বেশি বসত করছে বলে গ্রামের তুলনায় এখানে প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা কম; বন, কৃষিজমি, তৃণভূমি, জলাভূমি এসব কমে আসার ফলে। কিন্তু সৌখিন মানুষের চাহিদার কারণে মোট জীববৈচিত্র যে এখানে গ্রামাঞ্চল থেকে কম তা হয়তো বলা যাবেনা। বাগান, নার্সারি, পোষা পশু-পাখি ইত্যাদি মানুষের বাসার সঙ্গে তো থাকেই, আর এদের অনেকে মানুষের পোষ্য না থেকে মুক্ত হয়ে শহরতলীর বন্য বাসিন্দাও হয়ে পড়ে। এদের অনেকে হয়তো বালাই, আগাছা বা পরজীবীতে পরিণত হয়।

তারপর শহরতলী ছেড়ে নগর আর মহানগরের মধ্যে যখন এসে পড়ি তখন এসব একেবারে বদলে যায়। এখানে জীব বলতে যা কিছু আছে মানুষকে কেন্দ্র করেই তার সবকিছু। পার্ক, পথের ধারের বৃক্ষ ইত্যাদিকে ঘিরেই অনেকটা প্রতীকী অর্থেই এখানকার জীববৈচিত্র। অন্যদিকে এখানে মানুষের সৃষ্টি বর্জ্যের পরিমাণ পর্বত-প্রমাণ। জৈব উৎপাদন কথা যদি ধরি তার কিছু মাত্রতো নেইই (কারণ প্রায় পুরো অঞ্চলটিতে ইট পাথরের প্রাধান্য) বরং উৎপাদনটি ঋণাত্মক। প্রাথমিক জৈব উৎপাদনের সব কিছু বাইরে থেকেই আসে– মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং মানুষ বহির্ভূত অন্যান্য জীববৈচিত্রের রসদ হিসেবে; তাদের সার, খাদ্য ইত্যাদি হিসেবে।

আমাদের কাছে নিজেদের গ্রাম, শহরতলী, নগরকে মোটেও কোন ব্যত্যয় বা বিপর্যয় বলে মনে হয়না, বরং এগুলো আমাদের সৃষ্টিশীলতার অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের কথায় যদি আসি– তার বৃহত্তর পটভূমিতে এগুলো প্রকৃতিতে ছন্দ পতন, বড় বিপর্যয়। যুগে যুগে দৃশ্যপটের গড়ে উঠার কাহিনীতে এই বিপর্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়। মানব সভ্যতার আবির্ভাবের পর থেকেই কাহিনীর এই অংশের শুরু। তার মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো প্রায় দশ হাজার বছর আগে থেকে যখন শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ প্রথম কৃষিজীবী হয়ে উঠলো, এবং তারপর যখন নগরসভ্যতার জন্ম দিলো তখন থেকে।

নানা প্রবাহ, নানা পথচলা

বাহক ও বহন

দৃশ্যপটের এক উপাদান থেকে অন্য উপাদানে সব সময় নানা প্রবাহ চলছে। এই প্রবাহগুলো সম্পর্কে জানা দৃশ্যপটটির সার্বিক গতিময়তার উপলব্ধির জন্য খুবই জরুরী। এভাবে প্রবাহিত হচ্ছে মাটি, পানি, বাতাস ইত্যাদি। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে পুষ্টিদ্রব্য, শক্তি, জৈব বস্তু। আর অবশ্যই উদ্ভিদ ও প্রাণির প্রবাহ তো রয়েছেই। দুটি নিয়ম এখানে লক্ষণীয়। একটি হলো এসব প্রবাহে টুকরা, করিডর, ইত্যাদি উপাদানের সীমানাগুলো অনেকটা জীবকোষের ঝিল্লির মত কাজ করে– ঝিল্লির মতই এক রকম অর্ধপ্রবেশ্য বাধার মত থাকে সবকিছুর গতিপথে। জীবকোষের অর্ধপ্রবেশ্য ঝিল্লি যেমন বাইরে থেকে পুষ্টি ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত ভাবে কোষে ঢুকতে দেয়, এবং এর বর্জ্য ইত্যাদি কোষ থেকে বের হতে দেয়, তেমনি দৃশ্যপটে উপাদানের সীমানা বা কিনারাগুলো নানা প্রবাহের উপর নানা রকম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রবাহটি কিনারার সাথে লম্ব ভাবে ঘটতে পারে, যেমন টুকরা থেকে বাতাসে ধূলি প্রবাহ যদি করিডর ঝোপ সারির দিকে লম্ব ভাবে অগ্রসর হয় তা হলে ধূলি প্রবাহ এখানকার ঝোপে আটকা পড়ে যায়। আবার কোন প্রবাহ ঝোপ সারির সঙ্গে একই রেখায় হতে পারে যেমন করিডর দিয়ে প্রাণির চলাচল। আর লক্ষণীয় দ্বিতীয় নিয়মটি হলো পরস্পর সংলগ্ন দুটি উপাদানের মধ্যে যদি বয়সের অর্থাৎ পরিপক্কতার পার্থক্য থাকে, তা হলে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সী উপাদান থেকেই বেশি বয়সী উপাদানে প্রবাহ চলবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। যেমন যে তৃণভূমিতে যে অংশে এখনো তৃণ গজায়নি সেখান থেকেই ধূলি তৃণময়-টুকরার দিকে যাবে। তবে আবার ব্যতিক্রমী কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীতও হতে দেখা যায়– অর্থাৎ বেশি বয়সী থেকে কম বয়সী উপাদানেও প্রবাহ ঘটে। যেমন বাগানে ফল পেকে বীজ হয়েছে সেখান থেকে বীজ উড়ে যাবে এখনো অপরিপক্ক বাগানের দিকে।

অনেক প্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে তার বহন পদ্ধতি এবং বাহক। প্রধান বাহকদের মধ্যে রয়েছে বাতাস, পানি, উড়ন্ত প্রাণি– পাখি, বাদুড়, পতঙ্গ, মাটিতে চলা কিছু প্রাণি এবং মানুষ। বাতাস সব সময় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শক্তি, ধূলি, দূষণ, বীজ,

স্পোর - আরো কত কি। পানি মাটির উপর দিয়ে যেমন বয়ে যাচ্ছে, মাটির নিচে দিয়েও তা যাচ্ছে খনিজ পুষ্টি দ্রব্য বীজ, সার, দূষণ ইত্যাদি নিয়ে। আকাশের আর মাটির প্রাণিরাও নিয়ে যাচ্ছে বীজ, স্পোর ইত্যাদি গায়ের সঙ্গে আটকিয়ে, অথবা খেয়ে মলের সঙ্গে। এরকম কাজ মানুষও নিত্য করছে।

ভূমির ভেতরে ও বাইরে দিয়ে দৃশ্যপটে পানি প্রবাহ

বায়ু প্রবাহ মসৃণ সুশৃঙ্খল ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে না কি ঝড়ো এলোমেলো ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপারটি ভূমি-রূপ ও আবহাওয়ার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। যেমন সামনে পাহাড়ের খাড়া ঢাল এলোমেলো বাতাসের সহায়ক, অথচ ক্রমে একটু একটু করে মৃদু ঢাল নিয়ে পাহাড়ের যে চড়াই সেখানে বায়ুপ্রবাহও মসৃণ হয়। ঘন গাছপালার বন সামনে পড়লে বায়ু প্রবাহের বেগ কমে যায়। কোন কোন জায়গায় বায়ু বাহিত বালি ইত্যাদি গিয়ে বালিয়াড়ি সৃষ্টি করে যে ক্ষতি করে অথবা চাষের জমি থেকে উর্বর মাটি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে যে মরুময় অবস্থা সৃষ্টি করে তা প্রতিরোধ করার জন্য বৃক্ষ রোপন করা হয়। সামুদ্রিক ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের দেশেও সৃষ্টি করা হয়েছে উপকূলীয় বন। বাহক বাতাসই হোক আর পানিই হোক ইকোসিষ্টেমের জন্য যার প্রবাহটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মাটি এবং এর আনুসঙ্গিক পুষ্টিদ্রব্য। প্যানির ক্ষেত্রে প্রবাহের দিকটি সুনির্দিষ্ট– এটি সব

সময় নিচের দিকে যাবার চেষ্টা করে। পানির উৎসটি কী, ভূমির ঢাল কী রকম, মাটির প্রকার কী রকম– এ সব নানা জিনিসের উপর প্রবাহ নির্ভর করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎসটি বৃষ্টি। ঝুরঝুরে মাটি হলে অবক্ষয় সহজ হয়, ঢাল বেশি হলে প্রবাহের তোড় বাড়ে। মাটির তলা দিয়ে যে পানি প্রবাহিত হচ্ছে তার থেকে ভাসমান সব ধূলি-মাটি ইতোমধ্যে দূরীভূত হয়েছে, নিচে যাওয়ার সময় শিলাস্তরগুলোতে ফিল্টার হয়ে গিয়ে। এটি তাই দ্রবীভূত পদার্থই বহন করার কথা। তা অবশ্য নির্ভর করবে ভূ-অভ্যন্তরে যা কিছুর মধ্য দিয়ে পানি এগুবে তার ফিল্টার করার ক্ষমতার উপর অর্থাৎ তার গঠনের উপর।

এসব প্রবাহ ঘটছে পটভূমি থেকে টুকরায়, টুকরা থেকে টুকরায় বা করিডরে, করিডর থেকে টুকরায়– এমনি ভাবে নানা উপাদানের মধ্যে যা পুরো দৃশ্যপটে এক ধরনের গতিময়তা আনছে। এইসব প্রবাহের কারণে দৃশ্যপটের নানা উপাদানের মধ্যে এক রকম আন্তক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সার্বিক গতিময়তার ব্যাখ্যায় এই আন্তক্রিয়াগুলোও গুরুত্বপূর্ণ।

নানা উপাদানের মধ্যে আন্তক্রিয়া

ভূমির নানা টুকরার মধ্য দিয়ে জলস্রোত করিডরের কথা একবার ভাবা যাক। এর জলপ্রবাহের দুপাশের যে বিশেষ রকম উদ্ভিদ সমৃদ্ধ করিডর তা স্থলের পটভূমি থেকে জলস্রোতকে আলাদা করে। পটভূমি থেকে জলস্রোতে ভাসমান ও দ্রবীভূত পদার্থ কতখানি যাবে কি যাবেনা তাও এই করিডরই বেশ খানিকটা ঠিক করে দেয়। করিডরে উদ্ভিদ থেকে বীজ, পাতা, ওখানাকার পাখি বা কীট পতঙ্গ বাহিত জিনিস জলস্রোতে যাচ্ছে। আবার উদ্ভিদ অনেক কিছুকে আটকিয়েও দিচ্ছে জলস্রোতে যেতে না দিয়ে– আটকাচ্ছে পানিকে, ধূলিবালিকে, অবক্ষয়িত মাটিকে। ভূমি থেকে প্রাণিরা জলস্রোতের কাছে যাচ্ছে – কখনো একা, কখনো দলবদ্ধ ভাবে – হয়তো শুধু পানি খেতে। আসা যাওয়ার পথে তারা করিডরের পরিবর্তনও সাধন করছে– বীজ ইত্যাদি নিয়ে যাচেছ, ওখানে তীরের মাটি ভেঙ্গে ফেলছে, ওখানকার উদ্ভিদ খাচ্ছে, মাড়িয়ে তার ক্ষতি সাধনও করছে। করিডর সংলগ্ন পটভূমিতে পরিবর্তন ঘটলে তার প্রভাব করিডরের উপরও পড়ে। যেমন যেখানে উদ্ভিদ ধ্বংস হলে তার উপর দিয়ে গড়িয়ে আসা পানি অনেক বেশি পরিমাণে করিডরে আসবে। করিডরের উদ্ভিদ পটভূমি থেকে

আসা পুষ্টিদ্রব্যকেও যে ফিল্টারের মত আটকাতে পারে সেটি আমরা দেখেছি। কিন্তু এর ফলশ্রুতি বিভিন্ন রকম হতে পারে। এগুলো করিডরের ঐ উদ্ভিদের সঙ্গেই জমে উঠতে পারে, এমনকি ঐ অঞ্চলকে উঁচু করে তুলতে পারে। অবশ্য বন্যা বা বৃষ্টির তোড়ে তা ধুয়েও যেতে পারে মাঝে মাঝে। অথবা এগুলো এত মিহি পুষ্টিদ্রব্য হিসেবে আসে যে করিডরের উদ্ভিদই তা শোষণ করে নিয়ে সেখানে জৈব বস্তুর বৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

ঝোপ সারি বা বৃক্ষকুঞ্জের সারির সঙ্গে তার সংলগ্ন উপাদানের আন্তক্রিয়াগুলোও লক্ষ্য করার মত। ঝোপ সারির উদাহরণ থেকে আমরা এরকম অন্য করিডরের সঙ্গে সংলগ্ন অন্য উপাদানের আন্তক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাব। এরকম সংলগ্ন উপাদান হতে পারে মানুষের কাজে ব্যবহার্য মাঠ– কৃষিক্ষেত বা চারণভূমি; অথবা প্রাকৃতিক ভাবে বেড়ে ওঠা বৃক্ষবন, জলাভূমি, ঝোপঝাড়ের জংলা ইত্যাদি; অথবা ঘর-বাড়ি, খামার, কিংবা পুরো গ্রাম। এরকম সংলগ্ন উপাদানের সঙ্গে ঝোপ সারি যে ক্রিয়া করে তাতে মূল কাজটি হলো ওখানকার স্থানীয় ক্ষুদ্র-জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটানো। যেমন ঝোপ সারি যদি না থাকতো সেই অবস্থার তুলনায় এখন বাতাসের গতির দিকে বায়ুপ্রবাহ ব্যাহত হয়ে দিনের উত্তাপ বাড়বে এবং মাটির ও বাতাসের আর্দ্রতা বাড়বে, অন্যদিকে রাতের উত্তাপ কমবে, বাষ্পীভবনও কমবে। তা ছাড়া ঝোপ সারির জন্য পড়া ছায়ার প্রভাবতো আছেই। অনেকগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু ঝোপ সারির উচ্চতার তুলনায় ঝোপ সারি থেকে অনেকগুণ বেশি দূরত্বে ঐ ক্ষুদ্র-জলবায়ুর পরিবর্তনগুলো বিস্তৃত হয়– যেমন বাষ্পীভবন হ্রাস পেতে দেখা গেছে উচ্চতার প্রায় ১৬ গুণ দূরত্ব পর্যন্ত, আর বাতাসের গতি হ্রাস বজায় থাকে ২৮ গুণ দূরত্ব পর্যন্ত। যেখানে ভূমিতে অল্পবিস্তর ঢাল থাকে গড়িয়ে আসা পানি ঝোপ সারিতে আটকায়, ওখানে শোষিত হয়, ওখানকার শিকড় এ পানিকে ঝোপের পাতায় নিয়ে প্রস্বেদনে বাতাসে ছেড়ে দেয়। ফলে বন্যা কমে, মাটি শুষ্কতর হয়, বাতাস আর্দ্রতর হয়। আবার পাহাড়ী ঢালে ঝোপসারি মাটির ক্ষয় রোধ করে, উর্বরতা রক্ষা করে, নিচের দিকে নদী থাকলে সেই নদীতে পলি জমা কমায়, দূষণও কমায়। ঝোপ সারি এর সংলগ্ন মাঠের জীববৈচিত্রকে দু'ভাবে প্রভাবিত করে– প্রত্যক্ষ ভাবে সেখানকার ক্ষুদ্র-জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, আবার পরোক্ষভাবে নিজের মধ্যে থাকা কীট, পতঙ্গ, পাখি, স্তন্যপায়ীকে পাশের মাঠে কিছু কিছু ছড়িয়ে দিয়ে। এখান থেকে উদ্ভিদের বীজ, ফুলের রেণু ইত্যাদি ছড়াবার বিষয়টিও রয়েছে।

অনেক সময় কৃষিজমির কিনারায় এরকম ঝোপ সারি বা বৃক্ষ সারি থেকে উপকারী পাখি বা পতঙ্গ এসে ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ খেয়ে ফেলে বলে মনে করা হয়। এটি প্রাকৃতিক কীটনাশকের পর্যায়ে পড়ে। তবে বিষয়টি খুব স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়নি।

ঝোপ সারি যে রকম সংলগ্ন উপাদানের উপর ক্রিয়া করে তেমনি সেই উপাদানও ঝোপ সারির উপর ক্রিয়া করতে পারে। বাতাস, পানি, আগুণ ইত্যাদি জমি থেকে ঝোপ সারিতে যেতে পারে; তেমনি জমিতে ছড়ানো কীট নাশক ঝোপ সারিতে গিয়ে সেখানকার কীট পতঙ্গের ক্ষতি করতে পারে; মাঠের কিছু কিছু প্রাণি ঝোপ সারিতে গিয়ে সাময়িক আশ্রয়ও নিতে পারে। বনের সংলগ্ন ঝোপ সারিতে বনের উদ্ভিদ বিস্তৃত হতে পারে, তেমনি বনের প্রাণিও। আর বাড়ি ঘরের উপর ঝোপ সারির ক্রিয়াতো বেশ সুপরিচিত– কারণ সেক্ষেত্রে সাধারনত ঝোপ সারি তৈরিই করা হয় বাড়ির আবরু রক্ষায় আর ঝড়, বৃষ্টি, তুষার থেকে বাড়িকে সুরক্ষার জন্য। তাছাড়া একে বিশেষ বিশেষ পাখি, প্রজাপতি, উদ্ভিদ-প্রজাতি ইত্যাদিতে সুশোভিত করাও একটি লক্ষ্য থাকতে পারে। এসব দিক থেকে বাসা বাড়ির প্রয়োজনের প্রভাবটি ঝোপ সারির উপর গিয়ে পড়ে।

আফ্রিকার সেরেঙ্গেটিতে অসংখ্য প্রাণির বার্ষিক অভিবাসন

প্রাণি ও উদ্ভিদের চলাচল

দুটি অঞ্চলের মধ্যে কোন কিছুর আসা যাওয়া সার্বক্ষণিক বা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে হতে পারে, আবার থেমে থেমেও হতে পারে। দৃশ্যপটের বিভিন্ন উপাদানের একটি থেকে অন্যটিতে প্রাণি ও উদ্ভিদের চলাচলের ক্ষেত্রেও এই দু'রকমই হতে পারে। প্রাণির চলাচল কয়েকটি ভঙ্গিতে হয়ে থাকে। একটি হলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়া; আরেকটি হলো মৌসুমি অভিবাসন করে অন্য মৌসুমে আবার ফিরে আসা; এবং একই ভাবে এক মৌসুমে পর্বতের উপরে যাওয়া এবং অন্য মৌসুমে নেমে আসা– যাকে উপর নিচে খাড়া মৌসুমী অভিবাসন বলা যায়। সাধারণ অনেক প্রাণি শৈশবে পরিবারের সঙ্গে থাকলেও পূর্ণবয়স্ক হবার আগে পরিবার ছেড়ে এদিক ওদিক চলে যায় যা ইঁদুর থেকে শেয়াল পর্যন্ত অনেক রকমের প্রাণির ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এটিই ছড়িয়ে পড়ার চলাচল। মৌসুমী অভিবাসন আমরা যেরকম অতিথি পাখির ক্ষেত্রে দেখি অপেক্ষাকৃত শীত প্রধান ও উষ্ণ অঞ্চলের মধ্যে, তেমনি অন্যত্র দেখা যায় বাদুর, প্রজাপতি, হরিণ, বল্গা হরিণ ইত্যাদি বিচিত্র প্রাণির ক্ষেত্রে। পার্বত্য ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির ক্ষেত্রে মৌসুম বিশেষে পর্বতের উপরে বা নিচে গিয়ে চরতে দেখা যায় খাড়া অভিবাসনের উদাহরণ হিসেবে। প্রাণিভেদে এসব চলাচলের পরিসর বিভিন্ন হয়ে থাকে। আর এই পরিসর আবার দৃশ্যপটে টুকরা করিডর ইত্যাদির বিন্যাসের উপরও কার্যত নির্ভর করে।

গলায় রেডিয়ো ট্রান্সমিটার বাঁধা নেকড়ে বাঘ। টেলিমেট্রির মাধ্যমে দৃশ্যপটে তার চলাচল ও শারীরিক তথ্যাদি অনুসরণ করা হয়

একটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রাণিকে ধরে চিহ্নিত করে ছেড়ে দেয়া হয় এবং পরে অন্য জায়গায় তাদের ধরে চিহ্ন থেকে তাদেরকে সনাক্ত করে তাদের চলাচলের উপর গবেষণা করা হয়। তাছাড়া আরো নিয়মিত ভাবে চলাচলকে অনুসরণ করা হয় রেডিও টেলিমেট্রির মাধ্যমে – প্রাণির গলায় এমন রেডিও যন্ত্র সহ কলার পরানো হয় যাতে প্রাণির অবস্থান ও অন্যান্য শারীরিক তথ্য স্বয়ংক্রিয় ভাবে নিয়মিত বেতার তরঙ্গে সম্প্রচারিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ এভাবে সম্প্রচারিত বেতার সংকেত অনুসরণ করে এক রকম শিয়ালের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এটি চলে থেমে থেমে, এক নাগাড়ে নয়। শরত বা শীতকালে কিশোর-কিশোরী বয়সী শেয়াল এবং কিছু তরুণ শেয়ালও নিজ বাসস্থান ও পরিবার থেকে আশপাশে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে বিশেষ বিশেষ প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ শেয়াল এভাবে মূল পরিবারের এলাকা থেকে গড়পড়তা ৩১ কিলোমিটার এবং স্ত্রী শেয়াল ১১ কিলোমিটার দূরে চলে যায়, তবে সেটি সোজা পথে নয়, বরং অনেক ঘুরে ফিরে। বিভিন্ন রকম দৃশ্যপট উপাদান এর চলার পথে বাধা হিসেবে দেখা দেয়– যেমন কিছু করিডর। এমন কি চলাচলের জন্য সুবিধাজনক যেসব রাস্তা-করিডর তাও তারা সযত্নে এড়িয়ে চলে– বরং রাস্তা থেকে অনেক দূরত্ব বজায় রেখেই এরা চলে। অন্যদিকে ছোট নদী-করিডর তারা ঠিকই পার হয়ে যায়।

ভিন্ন রকমের একটি উদাহরণ হতে পারে নদীর উদ যা প্রধানত নদীর মাছ খেয়ে বাঁচে এবং প্রচুর ঘোরাফেরা করে। দৈনন্দিন ৩০ থেকে ৮০ কিলোমিটার জায়গার মধ্যেই নদীতে ঘুরে ফিরে এরা থাকে– যাকে তাদের হোম রেঞ্জ বা নিজস্ব এলাকা বলা যায়। কিন্তু কখনো কখনো এই হোম রেঞ্জ ছেড়ে আশপাশে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে নূতন হোম রেঞ্জও গড়ে। হোম রেঞ্জে ঘোরাফেরার সময় ডাঙায় উঠে সেখানে বেশি পথ এটি অতিক্রম করেনা– সাধারণত বড় বাঁকের কাছে নদীর এক অংশ থেকে অন্য অংশে সহজে যেতে যেটুকু দরকার ঐ টুকুই ডাঙার উপর দিয়ে যায়। ডাঙায়ও এরা নিচু পরিখা জাতীয় অঞ্চলের মধ্যে দিয়েই যাওয়ার চেষ্টা করে সম্ভব হলে ক্ষুদ্রতর জল-প্রবাহের মধ্য দিয়ে। যখন হোম রেঞ্জ ত্যাগ করে একবার অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন অবশ্য তাদেরকে ডাঙায় দীর্ঘ অঞ্চল অতিক্রম করে এক নদী থেকে অন্য নদীতে যেতে দেখা যায়। আবার অন্য উদকে দেখা যায় যে ডাঙায় খুব একটা না উঠেই নদী-

স্রোতের মধ্য দিয়ে নিজেদের হোম রেঞ্জ বাড়িয়ে নিয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের দৃশ্যপট বিন্যাসের উপর উদের চলাচল অভ্যাস অনেকটা নির্ভর করতে দেখা গেছে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃশ্যপটে ভিন্ন একটি প্রাণির চলাচলের উদাহরণ নেয়া যাক। পাহাড়ি মরু অঞ্চলে বাস করে খুবই মোটা শিংওয়ালা মরু-ভেড়া। এদের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে এরা সব সময় কোন পানি-উৎসের তিন কিলোমিটারের মধ্যে থাকে। কিন্তু এক পশলা ভারি বৃষ্টির পর নানা জায়গায় যখন অস্থায়ীভাবে পানি জমে তখন তাদেরকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে যেতে দেখা যায় নানা জায়গায় বৃষ্টির ফলে নূতন গজানো ঘাসের সদ্ব্যব্যবহার করতে। এছাড়া শুকিয়ে যাওয়া নদীর তলার উপর দিয়ে তাদেরকে বেশ চলাচল করতে দেখা যায়– ঘাসের সন্ধানে অথবা শিকারি প্রাণির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। উঁচু নিচু ভূমির সৃষ্ট ছায়াটিও তাদের খুব দরকার– তাই এরকম ছায়া থেকে সর্বোচ্চ দেড় কিলোমিটারের মধ্যেই থাকে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এরকম উঁচু-নিচু ভূমির আশ্রয়ের মাত্র আধ কিলোমিটার দূরের একটি ভাল পানির উৎস তারা ব্যবহার করছেনা। কারণ দেখা গেছে যে উভয়ের মাঝে রয়ে গেছে একটি বৈদ্যুতিক পাওয়ার লাইনের চলে যাওয়ার কারণে সৃষ্ট খোলার জায়গা। ও জায়গাটি উন্মুক্ত হওয়াতে সেখান দিয়ে পার হওয়াটা তারা নিরাপদ মনে করেনি। আবার অন্যত্র যেখানে পানির উৎস বিরল সেখানে পানির সন্ধানে তাদেরকে বিপজ্জনক হাইওয়ে, এমন কি জনবসতির পাড়াও অতিক্রম করতে দেখা গেছে। স্পষ্টত মরু-ভেড়া দৃশ্যপট বিন্যাসের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল, এবং তারা নিজেদের চলাচলে এই বিন্যাসকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

সব ধরনের প্রাণির সমীক্ষা থেকে দৃশ্যপটে চলাচলের ক্ষেত্রে কতগুলো সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায়। সাধারণত বড় বড় টুকরা বা অন্য কিছু উপাদান যাদেরকে প্রতিকূল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, প্রাণি সেগুলোকে এড়িয়েই চলাচল করে। জনবসতি, শহর, জলা, হ্রদ ইত্যাদি বড় এবং সমসত্ত্ব টুকরা এর ভেতরে পড়ে। নিজেদের আবাসের সংলগ্ন জায়গায় একাধিক রকমের দৃশ্যপট উপাদান থাকাটি প্রাণির চলাচলের জন্য সুবিধাজনক। যেখানে এরকম একাধিক ইকোসিস্টেম মিলিত হয়– সেখানটিই যেন চলাচলের জন্য সব চেয়ে সুবিধাজনক। কিছু কিছু করিডর চলাচলের পথ হিসেবে কাজ করে, কিছু করিডর পথ না হলেও অন্তত চলাচলে বাধা হয়না,

দৃশ্যপটের নানা উপাদানকে আশ্রয় করে প্রাণি এখানে চলাচল করে

আবার কিছু করিডর রীতিমত বাধা হয়ে দাঁড়ায় চলাচলের জন্য। চওড়া বাঁধানো সড়ক পথ বড় প্রাণির জন্য একেবারে বাধা না হলেও এগুলো প্রাণির চলাচলের পথ হিসেবে সাধারণত ব্যবহৃত হয়না। কিন্তু গ্রামের ছোট রাস্তা, মেঠো পথ এসব করিডর প্রাণি চলাচলেরও পথ হতে পারে। ঝোপ সারি অনেক রকম প্রাণির চলাচলের ভাল পথ, এবং অধিকাংশ প্রাণির জন্য এই করিডর কোন বাধা নয়। ছোট নদীর করিডর অনেক প্রাণির জন্য পথ নয়– যেমন শেয়ালের জন্য নয়, কিন্তু আবার উদের জন্য এটি ভাল পথ। নদী পারাপার চলাচলে বড় বাধা হতে পারে, বিশেষ করে বড় নদী। মৌসুমী অভিবাসন যাদের রয়েছে তাদের জন্য বছরে দু'বার শীত ও গ্রীষ্মে পরস্পর বিপরীত অভিবাসন হওয়াটাই স্বাভাবিক– হরিণ এটি করে, উদ করে, আরো অনেক প্রাণি করে। অনেক সময় চলাচলের ক্ষেত্রে এক একটি জায়গা কেন্দ্রীয় বড় আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় যাকে হট স্পট বলা হয়। অভিবাসী বালি হাঁসের জন্য বড় হ্রদ এই ভূমিকা নেয়, আর অভিবাসী হরিণের জন্য বৃক্ষ সমৃদ্ধ জলা ভূমি। তবে সব প্রাণির চলাচলের জন্য এক রকমের দৃশ্যপট উপাদানের একই ভূমিকা আশা করা যায়না। এর বড় কারণ নানা প্রাণির কার্যকর যে আয়তন তা কিন্তু যথেষ্ট বিভিন্ন। এই কার্যকর

আয়তনের বিষয়টি আমরা আগে দেখেছি। দৃশ্যপট উপাদানের কার্যকর আয়তনের (গ্রেইন সাইজ) সঙ্গে প্রাণিটির নিজের কার্যকর আয়তনের খাপ খাওয়াবার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে– তার চলাচলও এর ব্যতিক্রম নয়।

উদ্ভিদের চলাচলের কথায় যখন আসি তখন প্রধানত বীজ ইত্যাদি ছড়ানোর মধ্য দিয়ে বংশ বিস্তারকেই বুঝাতে হয়। বীজ আশেপাশে অল্প দূরত্বে ছড়ায় অনেক উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই। এই দূরত্ব কয়েক মিটারের থেকে শুরু করে বড় জোর কয়েক শ' মিটার হয়ে থাকে। আর এগুলো সাধারণত ছড়ায় উদ্ভিদ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে, বীজাধার বিস্ফোরণের মত হঠাৎ ফেটে পড়ে বীজ বন্দুকের গুলির মত ছুটে গিয়ে, অথবা স্বল্প দূরত্বে চলা ফেরা করা পাখি বা পশু দ্বারা বাহিত হয়ে। আবার কিছু উদ্ভিদের বীজ অনেক দূর দূরান্তেও ছড়াতে পারে বাতাসে বা পানিতে ভেসে এবং এভাবে একেবারে ভিন্ন দৃশ্যপটে নিজের বংশকে চালান করে দিতে পারে। এভাবে সমুদ্র স্রোত নারকেলকে নিয়ে যেতে পারে হাজার কিলোমিটার দূরে, দেশান্তরী পাখিও নিয়ে যেতে পারে বীজ। এসবের মধ্যে উদ্ভিদের চলাচলকে আমরা তিন রকমে দেখতে পারি। অনেক সময় বৃষ্টিপাত বা অন্য আবহাওয়াগত কারণে উদ্ভিদ সমৃদ্ধ জায়গার গণ্ডি প্রসারিত বা সংকুচিত হয়। এও উদ্ভিদের এক রকম চলাচল। দ্বিতীয় ধরনের চলাচল আরো অনেক দীর্ঘমেয়াদী এবং দীর্ঘ দূরত্বে হতে পারে– তা হলো দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তনে একটি অঞ্চল যদি তার বর্তমান কোন উদ্ভিদ প্রজাতির অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে তা হলে সেটি সেখানে লোপ পাবে, হয়তো অন্য একটি অঞ্চলে যেখানে এটি আগে ছিলনা সেখানে এটি বিকশিত হবে। এও এক ধরনের চলাচল। তৃতীয় আর এক ধরনের চলাচল ঘটে যখন একটি বিজাতীয় উদ্ভিদ কোন নূতন অঞ্চলে চলে যায়, অথবা তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন কচুরী পানা আমাদের দৃশ্যপটে এক সময় ছিলনা। উনবিংশ শতাব্দীতে শখ করে এটি ব্রাজিল থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এটি এখন আমাদের অসংখ্য দৃশ্যপটের অংশ হয়ে গেছে।

দৃশ্যপটের বিভিন্ন উপদানের মধ্যে এই যে সব গতিময়তা তার গবেষণা দৃশ্যপট বিজ্ঞানকে বুঝার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগও রয়েছে। যাঁরা ক্ষতিকর প্রাণি বা উদ্ভিদ দমনে ব্যস্ত এটি তাদের কাছে খুবই কাজে আসতে পারে। তেমনি যারা বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের বিকাশ ঘটাতে চান তাঁদের ক্ষেত্রেও।

একটি উদাহরণ নেয়া যাক। যদি জিন-কারিগরির মাধ্যমে আমরা একটি শস্য প্রজাতিকে কোন ক্ষতিকর পতঙ্গের প্রতিরোধী করে তুলতে পারি তা হলে ঐ শস্য পতঙ্গটি থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু ক্ষতিকর পতঙ্গটি যেখানেই আছে সেখানেই যত্রতত্র যদি প্রতিরোধী শস্যটি চাষ করি, তা হলে ঐ পতঙ্গের উপর বেশিদিন আর এই প্রতিরোধ কাজ করবেনা। কারণ ওরা শিগ্‌গির প্রতিরোধী শস্যটির বিরুদ্ধে নিজেরও সহনশীলতা গড়ে তুলবে। তবে যদি পুরো বিষয়টিকে দৃশ্যপটের বিবেচনায় দেখা হয় তা হলে শুধু ঐ শস্যের জন্য সব চেয়ে উপযুক্ত জায়গাগুলোতেই প্রতিরোধী শস্যগুলো লাগাবো যদি যে জায়গাগুলো ঐ ক্ষতিকর পতঙ্গের চলাচলের পথে পড়ে। তা হলে সহজে পতঙ্গটি প্রতিরোধে সহনশীল হয়ে যেতে পারবেনা।

নক্সী কাঁথার স্থিতি-অস্থিতি

স্থিতি হারায় কী ভাবে?

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সিডরের মত একটি ঘূর্ণিঝড়, বা জাপানের ফুকুশিমার উপর একটি সুনামি দৃশ্যপটকে রাতারাতি একেবারে বদলে দিতে পারে। সেগুলো হঠাৎ হঠাৎ ঘটা দুর্যোগের ফলে পরিবর্তন। কিন্তু দৃশ্যপটের অধিকাংশ পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে– ছোট ছোট অনেক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায়। প্রকৃতির নক্সী কাঁথাটির নক্সা এ ভাবেই ধীরে ধীরে রূপ বদল করে– যেটি চোখে ধরা পড়তে হয়তো কয়েক দশক লেগে যায়, এমন কি শতাব্দীও। তবে এই কালের পরিধিটি কিছুটা নির্ভর করছে আমরা কোন পর্যায়ের পরিবর্তনের কথা বলছি তার উপর। এটি যদি ছোট পর্যায়ে খুব স্থানীয় পরিবর্তন হয় তা হলে হয়তো অল্পদিনের পরিবর্তনগুলোও গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু আরো বড় পর্যায়ে সার্বিক ভাবে নিলে হয়তো অনেক বেশি সময়েই পরিবর্তনগুলোই শুধু গ্রাহ্য হয়। তবে সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয় হলো পরিবর্তনের মূল প্রবণতাটি কোন দিকে; এর মধ্যে দোলকের মত আবর্তিত কোন উঠা-নামার স্পন্দন রয়েছে কিনা অর্থাৎ একবার এদিকে আবার উল্টো দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে কিনা, আর যদি তা থাকে সেই স্পন্দনের তীব্রতাটি কতখানি; স্পন্দনের মধ্যে কোন রকম সরল ছন্দ রয়েছে কিনা; নাকি ব্যাপারটি অনিয়মিত। এই পরিবর্তনের বিষয়গুলো বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ে, যখন তাঁরা তথ্য নিয়ে সময়ের সঙ্গে সুগলোর গ্রাফ তৈরি করেন।

পরিবর্তনের এই ভঙ্গির বিবেচনায় কোন কোন দৃশ্যপটকে আমরা স্থিতিশীল বলতে পারি? স্থিতিশীল তখনই আমরা বলবো যখন উল্লিখিত গ্রাফটি মোটামুটি ভূমি সমান্তরাল হবে অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে দৃশ্যপটের কোন বৈশিষ্ট ক্রমাগত এক নাগাড়ে বাড়তে বা ক্রমাগত কমতে থাকবেনা, বড় জোর অল্প বিস্তর উঠানামা করতে পারে, তাও নিয়মিত ছন্দে। এরকম স্থিতিশীলতা একেবারে স্থিরতা নয়, বরং পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এটি যাচ্ছে, কিন্তু সেই পরিবর্তনগুলো এক ধরনের ভারসাম্যের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে – স্পন্দিত হচ্ছে কিন্তু তা একটি মূল আদি অবস্থার অল্প এদিক ওদিক স্পন্দিত হচ্ছে ও বার বার সেই অবস্থায় ফিরে আসছে। অন্যদিকে একটি দৃশ্যপটকে

তখনই অস্থিতিশীল বলবো যখন এর স্পন্দন মূল আদি অবস্থায় ফিরে না এসে বরং অন্য একটি নূতন মূল অবস্থায় চলে যায়। এরকম অবস্থায় স্পন্দনের ফলাফলকে আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব কঠিন হয়। এরকম অস্থতিশীলতা অবশ্য অস্থায়ী হতে পারে, আবার স্থায়ীভাবে অস্থিতিশীল হতে পারে। ধরা যাক শক্ত কাষ্ঠময় বৃক্ষের একটি পুরানো বনের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এর নিজস্ব একটি স্থিতিশীলতা রয়েছে। কিন্তু একে যদি কিছু গাছ কেটে নূতন গাছ লাগিয়ে নিয়ন্ত্রিত বনের ভিন্ন ভারসাম্যে আনি তা হলে সেটি হবে একটি অস্থায়ী অস্থিতিশীলতা। নূতন গাছগুলো বড় হয়ে তাকে আবার স্থিতিশীল করবে পুরানো বনের মতই। কিন্তু অনুর্বর শুষ্ক এলাকার তৃণভূমিতে কর্ষণ করে যদি শস্য ফলাবার চেষ্টা করি তা হলে স্বাভাবিক ভাবে চাষাবাদ ওখানে হবেনা। বরং প্রায়শ খরার কবলে পড়ে ফসল মার খাবে। সেক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতাটি স্থায়ীরূপ নেবে, কারণ এ অবস্থা থেকে উঠে আসা দুরূহ।

স্থিতিশীলতার পরিমাপে দুটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয়– একটি হলো প্রতিরোধ ক্ষমতা, অর্থাৎ নানা শক্তির প্রভাবে পরিবর্তন হওয়ার বিরুদ্ধে দৃশ্যপট কতখানি বাধা দিতে পারে তা; অন্যটি হলো পুনরূদ্ধার কাল, অর্থাৎ পরিবর্তিত হবার পর আবার পূর্ণাবস্থায় ফিরে আসতে তার কত সময় লাগে তা। ছোট ছোট পরিবর্তনগুলোকে একটি সময়ের উপর গাণিতিক ভাবে সমাকলিত করা যায়– অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরপর পরিবর্তনগুলোর একটি সমষ্টি উচ্চ গাণিতিক পদ্ধতিতে বের করা যায়। পরিবর্তনের এই গাণিতিক সমষ্টিটি যদি ছোট হয় তা হলে দৃশ্যপটকে স্থিতিশীল বলা যায়। অবশ্য এই সমাকলনের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতার ও পুনরুদ্ধার কালের অবদানটি এমনভাবে মিশে আছে যে তার ফল থেকে এ দুইয়ের প্রভাবকে আলাদা করা যায়না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা যদি এমন দুটি দৃশ্যপটের স্থিতিশীলতা বিবেচনা করি যার একটিতে প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বলে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু পুনরূদ্ধার কাল কম বলে এই পরিবর্তন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি; আর অন্যটিতে পরিবর্তন ঘটেছে কম কিন্তু পুনরূদ্ধারে সময় লেগে গেছে দীর্ঘ দিন। এই উভয়ের ক্ষেত্রে গাণিতিক সমষ্টিটি সমান হতে পারে, অর্থাৎ স্থিতিশীলতার পরিমাপটি এক হতে পারে; কিন্তু তার থেকে বুঝার উপায় থাকেনা যে এই ফলাফলের পেছনে কিসের দায়িত্ব রয়েছে। সেটি জানার জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা ও পুনরূদ্ধার কালকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়।

অনেক দৃশ্যপটের এক রকম আপাত-স্থিতিশীলতা থাকে যাকে প্রকৃত স্থিতিশীলতা বলে ভুল হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ উত্তর আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির ঠিক দক্ষিণে সাহেলের তৃণভূমি ছিল হাজার বছর ধরে স্থিতিশীল। অবশ্য সব সময় শুষ্ক ও বৃষ্টির মৌসুমের নিয়মিত আবর্তন ওখানে ছিল, কিন্তু একে বলা যায় একটি অনুচ্চ নিয়মিত স্পন্দন যার গড়পড়তা ফলাফল ছিল স্থিতিশীলতা। এতে বৃষ্টির মৌসুমে বর্ষজীবী ঘাস কয়েক সপ্তার মধ্যে চমৎকার বেড়ে উঠে সাহেলকে উন্নত চারণভূমিতে পরিণত করতো, আর দীর্ঘজীবী উদ্ভিদগুলো এ সময় নূতন পাতা মেলে সামনের শুষ্ক মৌসুমের চারণ পশুর কাজে লাগার মত খাদ্য তৈরি করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। এ সময় সাহেল অঞ্চলে সামাজিক পরিবর্তন এসে যাযাবর জীবনের বদলে স্থায়ী বসতের দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়ে। এ অবস্থায় লোক সংখ্যার ঘনত্ব বাড়ে, আর যে পশুদল তখনো তাদের জীবিকার উপায় সেগুলো তখন স্থায়ী বসতের থেকে বেশি দূরে চরতে যাচ্ছিল না। তৃণ ভূমির উপর তাই চাপ বাড়ছিলো। অবশেষে ১৯৭০ এর দশকে এসে সাহেলের স্থিতিশীলতা ভেঙ্গে পড়লো। তখন বুঝা গেল সাহেলের দৃশ্যপটটি আদিতেও প্রকৃত অর্থে স্থিতিশীল ছিলনা, ছিল আপাত-স্থিতিশীল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাই এটি অল্প সময়ে ভারসাম্য হারিয়েছে। ১৯৭০ এর পর মাত্র এক দশকের একটানা খরার প্রভাবে অল্প কিছু কূপের আশপাশে জন্মানো সীমিত ঘাস পশুদল এমন ভাবে সমূলে খেয়ে বিনাশ করছে যা পরে পুনর্জাগ্রত হতে পারিনি। ফলে উদ্ভিদের সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ পশুদলও ধ্বংস পেয়েছে। আগেকার ছন্দিত পরিবর্তনের বদলে দেখা দিয়েছে অনিয়মিত উচ্চ মাত্রার স্পন্দন– যাতে বুঝা যায় যে আগেরটা ছিল আসলে আপাত-স্থিতিশীল অবস্থা।

আসলে সত্যিকার স্থিতিশীলতা বলতে কিছু দৃশ্যপটে পাওয়া বিরল ঘটনা। বিভিন্ন আপাত-স্থিতিশীল অবস্থা থাকাটাই নিয়ম, এবং এর মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দেয় রীতিমত অস্থিতিশীলতা। সাধারণভাবে এর একটি মডেল খাড়া করা যেতে পারে যার মাধ্যমে দৃশ্যপটের পরিবর্তনকে বিভিন্ন পারিবেশিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে বুঝা যেতে পারে। কোন বিপর্যয় যদি বাধ না সাধে তা হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটে অধিকতর জৈব বস্তু জমতে থাকে। ব্যাপারটি সরল রৈখিক নয় বরং শুরুতে ধীরে বেড়ে এর পর জৈব বস্তু খুব দ্রুত হারে উর্দ্ধমুখি হয় তারপর তার বাড়ার হার আবার ক্রমে কমে আসে, অবশেষে একটি উচ্চতম পরিমাণে গিয়ে স্থিতিশীল অবস্থা পায়।

এর মধ্যে কোন বিপর্যয় যদি ঘটে তবে জৈব বস্তুর পরিমাণ ঐ অবিপর্যস্ত পথ থেকে সরে যাবে। বিপর্যয় যদি দূষণ, অতি-চারণ, ঘূর্নিঝড় ইত্যাদির মত হয় তা হলে এই সময় জৈব বস্তু কমে যাবে। কিন্তু চারা বা বীজের যোগান থাকলে ধীরে তার পুনরুদ্ধার হয়। আর তেমনটি না হলে এটি সম্পূর্ণ নূতন একটি দৃশ্যপট পরিবর্তন রেখায় চলে যেতে পারে যার সব বিন্দুতেই জৈব বস্তুর পরিমাণ আগেরটির চেয়ে কম। তখন পরিচিত দৃশ্যপটটিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

পরিবর্তনের পেছনে বল

পরিবর্তনের পেছনের বলগুলো কখনো খুব স্পষ্ট হয়ে আসে, কিন্তু অন্য সময় তেমন স্পষ্ট হয় না। যখন আমরা একটি বন কেটে ফেলি বা কোন জায়গায় দিয়ে মহাসড়ক বা দালান তৈরি করে তখন বলের প্রয়োগটি খুবই স্পষ্ট– কারণ যন্ত্রপাতি, শ্রমিক সবার বল-প্রয়োগের আয়োজনটি চোখের সামনে ঘটছে। প্রাকৃতিক কারণে যখন পরিবর্তন ঘটে তখন কিন্তু বল কোথায় কে কী ভাবে প্রয়োগ করছে সব সময় বুঝা যায়না। এর মধ্যে সবই শুধু বৃষ্টিপাতের, শিলাবৃষ্টির, জগদ্দল হিমাবাহের ভারী ঘর্ষণ, এ সব ধরনের জড় বস্তুর প্রযুক্ত বল নয়; বরং নানা প্রাণির দৈহিক বলও এর অন্তর্ভূক্ত– যার মধ্যে কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে মদমত্ত হাতী পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃতিতে এসব বল প্রয়োগ অধিকাংশ সময় অলক্ষ্যে ঘটে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ পূর্ব আফ্রিকার উচ্চ সমতল ভূমিগুলোর কথা বলা যায়। এখানে মৃদু পাহাড়ী ঢালের খুব সমৃদ্ধ মাটি বাতাস ও পানি বাহিত হয়ে নিচে উপত্যাকা অঞ্চলে উর্বর বনভূমি গড়ে তুলেছে। কিন্তু ঐ বাতাস আর পানি কিছুই করতে পারতোনা যদি ঢালের গায়ে মাটির সঙ্গে মেশানো উই পোকাগুলো উর্বর মাটি তৈরি করে না দিত। এখানে ঐ উই-বলই প্রাথমিক কাজটি করে দিয়েছে দৃশ্যপট বদলের পেছনে। উদ্ভিদের কথাটিও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদের যে উর্দ্ধমুখি যাত্রা তার বলটিই হলো সব দৃশ্যপটের প্রযুক্ত সব চেয়ে সাধারণ বল।

বল যে রকমই হোক না কেন তার সামগ্রিক পরিমাণটিই ঠিক করে দেবে একটি দৃশ্যপট কী ভাবে বদলাবে। পরিবেশের স্বল্প পরিবর্তনের বল দৃশ্যপটকে বদলায় বটে কিন্তু সেটি ঘটে অল্প পরিমাণে এবং প্রায়শ সেটি একটি দোলকের দোলনের মত মূল

অবস্থার এদিক ওদিক পরিবর্তিত থাকে। সাধারণ বৃষ্টির বল বর্ষায় নদীকে যেমন ফুলিয়ে তোলে, বৃষ্টির মৌসুম গেলে তাকে আবার কমিয়ে ফেলে– দুই মৌসুমের দৃশ্যপটে এই মৃদু দোলন চলতেই থাকে একটি স্থিতিশীলতার মধ্যে। কিন্তু একটি বিশেষ মাত্রা অতিক্রম করলে বল প্রয়োগের ফলশ্রুতি বিপর্যয়ে পরিণত হয়। সেই বিপর্যয়টি যদি পরিমিত মাত্রায় হয় তা হলে স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েও কিছু কালের মধ্যে আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। যেমন কম মাত্রার অতিবর্ষণে অনেক অঞ্চল প্লাবিত হয়। শুষ্ক মৌসুম এলেও অনেক নিচু জায়গা জলমগ্নই থাকে, এবং দৃশ্যপটের বেশ কিছু টুকরা বছর জুড়ে ডুবে থাকে। এর মানে আগে দৃশ্যপটে পরিবর্তনের যে মৌসুমী দোলন ছিল এখনকার দোলনের চিত্রটি তার থেকে ভিন্ন। এ ভাবে দু'এক বছর পর অবশ্য ঐ ডুবা টুকরাগুলো শুকিয়ে যাবে এবং আবার পুরানো স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।

কিন্তু বিপর্যয়ের বল যদি পরিমিতির মধ্যে না থেকে ভয়ানক ভাবে মাত্রাতিরিক্ত হয় তখন পরিস্থিতি বদলে যায়। পর পর তীব্র খরা, অথবা অবিবেচকের মত ভূগর্ভস্থ পানি তুলে ফেলায়, অথবা অত্যন্ত বেশি চারণের ফলে কোন উদ্ভিদময় জায়গা যখন মরুতে পরিণত হয় তখন সেটি আর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারেনা। আফ্রিকার সাহেলে সেটিই হয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগে যে দৃশ্যপটের স্থিতিশীলতা স্থায়ীভাবে বদলে যায় তার আরো নাটকীয় হাতেনাতে দৃষ্টান্ত হলো নির্মাণ কাজে বুলডোজারের বল প্রয়োগ। বুলডোজারের প্রবল কাজের ফলে মরুভূমি থেকে বনভূমি প্রায় সব রকমের দৃশ্যপট অল্প সময়ের মধ্যে চিরতরে বদলে গিয়ে শহর বা শহরতলীতে পরিণত হতে পারে।

স্থিতিশীলতার পক্ষের গুণাবলী

স্থিতিশীল, আপাত-স্থিতিশীল, অস্থিতিশীল সব রকমের পরিস্থিতি আমরা দৃশ্যপটে দেখলেও দীর্ঘ সময়ের নিরিখে দেখলে অধিকাংশ দৃশ্যপটকে আমরা আশ্চর্য রকম স্থিতিশীল হতে দেখেছি, প্রায়শ নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও। এখনো অনেক দৃশ্যপট দুনিয়াজোড়া রয়েছে যা বহু হাজার বছর ধরে একই ভাবে স্থিতিশীল রয়েছে। শেষ পর্যন্ত এরকম স্থিতিশীল থাকার সপক্ষে দৃশ্যপটের কিছু বিশেষ গুণ রয়েছে।

আলো সব দৃশ্যপটে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি– স্থিতিশীলতার সপক্ষের একটি জিনিস এই আলোর উপরেই নির্ভর করে জৈব বস্তুর প্রাথমিক সৃষ্টি। কিন্তু দৃশ্যপটের মধ্যে নানা টুকরায়, করিডরে বা পটভূমিতে আলো বিন্যস্ত হতে গিয়ে সেই জৈব বস্তুর বন্টনে পার্থক্য ঘটে– দেখা দেয় সমসত্ত্বতার অভাব। এরই অনুসঙ্গ ধরে দৃশ্যপটের এসব উপাদানের মধ্যে পার্থক্য ঘটে প্রাণি, উদ্ভিদ, পানি, খনিজ পুষ্টিদ্রব্যের প্রবাহে। সব মিলে দৃশ্যপটের মধ্যেই একটি নমনীয়তা তৈরি হয় যা কিনা পারিবেশিক পরিবর্তনশীলতাকে নিজের মধ্যে সামলে নিতে পারে। একটি নমনীয় স্প্রিং যেমন বাইরের আঘাতকে নিজের মধ্যে শোষণ করে নিতে পারে এও যেন সেরকম ব্যাপার। ফলে স্প্রিং এর মতই দৃশ্যপট বাইরের বলের কারণে পরিবর্তিত হলেও নিজগুণে আবার পূর্বাবস্থায় ফেরৎ যেতে পারে, স্প্রিং এর মতই।

স্থিতিশীলতার পক্ষে দৃশ্যপটের দ্বিতীয় গুণটি হলো দৃশ্যপট জীব-প্রজাতির আসা যাওয়া, খনিজ পুষ্টিদ্রব্যের আসা যাওয়া, কিংবা পানির আসা যাওয়ার বিষয়ে সর্বদা উন্মুক্ত। দৃশ্যপটের মধ্যে এগুলো যতটা পাওয়া যায় তার চেয়ে এদের অনেক বেশিটা দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে চলে যায়। এই আসা যাওয়াটি দৃশ্যপটকে বিপর্যয়ে অধিক কাহিল হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়। যেমন বৃষ্টির পানি যখন এতে আসে তখন খরার উপশম হয়; নদী বয়ে পানি চলে যেতে পারলে বন্যার উপশম হয়; মরুকরণের উপক্রমে থাকা ভূমিতে বায়ুবাহিত বীজ আবার একে শ্যামল করে; পঙ্গপাল একটি দৃশ্যপট থেকে চলে গেলে আবার এখানে ফসল হয়; ইত্যাদি। কাজেই ঐ আসা যাওয়া প্রবাহগুলো দৃশ্যপটের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পুনরুদ্ধারকাল কমায়।

স্থিতিশীলতার তৃতীয় গুণটি আরো বেশি মৌলিক ও চিরায়ত– এটি হলো বিবর্তন। বড় বিপর্যয় যখন দৃশ্যপটকে গ্রাস করে তখন সেখানকার জীবদের মধ্যে অথবা ওখানে নূতন করে আসা জীবদের মধ্যে কিছু কিছু নূতন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে পারে বেশি; প্রাকৃতিক নির্বাচনে এগুলোই টিকে থাকে। এভাবে ঐ বিপর্যস্ত দৃশ্যপটের উপযুক্ত জীব ওখানে বিবর্তিত হয়। কাজেই ঐ নূতন জীবরাই তাকে বিপর্যয় থেকে উঠে আসতে সহায়তা দেয়।

এ সব গুণের মধ্যে আমরা দেখি দৃশ্যপট নিজের মধ্যে বিচিত্রতা ধারণ করে বলে, এতে প্রবাহ আছে বলে, এতে জীব বিবর্তন আছে বলে, অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে এর সক্রিয় আদান প্রদান আছে বলেই এর দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা সম্ভব হয়।

নানা দৃশ্যপটের মধ্যে সম্পর্ক-সংঘাত

এ পর্যন্ত আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি দৃশ্যপটের অভ্যন্তরের কথা বলেছি, ঐ দৃশ্যপটের বিভিন্ন উপাদান, সেগুলোর মধ্যে যোগাযোগ, প্রবাহ ইত্যাদির কথা। কিন্তু একটি দৃশ্যপট শেষ হয়ে যখন আরেকটি শুরু হয় তখন এই দুইয়ের মাঝে সীমানাটি কত স্পষ্ট? এই দুটিকে পৃথক দৃশ্যপটই বা বলছি কেন। দুটি দৃশ্যপট ভিন্ন হবে যদি তাদের ভূমি-রূপ যথেষ্ট ভিন্ন ধরনের হয়, উভয়ের উপর প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট প্রভাব বা বিপর্যয়গুলো যদি যথেষ্ট ভিন্ন হয়, তবে। আসলে এই বিষয়গুলোই যে এক একটি দৃশ্যপট গড়ে তোলে সেটি আমরা আগে দেখেছি। কাজেই একটি পার্বত্য বনভূমি অঞ্চল শেষ হয়ে যখন একটি নদী অববাহিকা শুরু হয় তখন আমরা এক দৃশ্যপট থেকে অন্য দৃশ্যপটে চলে আসি বৈ কি। পাশাপাশি এই দুটিকে স্পষ্ট আলাদা ভাবে ভাল দেখা যাবে যদি আমরা একাধিক দৃশ্যপটকে উপরে বিমান থেকে তোলা ছবিতে দেখি। দৃশ্যপট সৃষ্টিকারী ঐ ব্যাপারগুলোর মধ্যে দৃশ্যপটের সীমানা স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে সব চেয়ে কার্যকর হয় ভূমি-রূপ এবং এর উপর প্রাকৃতিক প্রভাবগুলো– যেমন পার্বত্য অঞ্চল নদীর ক্ষয়ীভবনের ফলে নদী অববাহিকায় সমতলে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের সৃষ্ট প্রভাবগুলো দৃশ্যপটগুলোকে কিছুটা একাকার করে দিতে চায় ওদের সীমানাকে কিছুটা ঘোলাটে করে দিয়ে। এর কারণ মানুষের প্রভাবগুলো উভয় দৃশ্যপটে একই ভাবে উপরিপাতিত হতে পারে– যেমন একটি মহাসড়ক নীচু সমতল ভূমি থেকে হয়তো মসৃণ ঢালের পার্বত্য ভূমির মধ্য দিয়েই চলে গেছে উভয় পটভূমিকে কিছুটা একাকার করে দিয়ে।

একই দৃশ্যপটের বিভিন্ন উপাদান– টুকরা, করিডর, এবং পটভূমির মধ্যে যেমন নানা কিছুর প্রবাহ ও চলাচল রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন দৃশ্যপটের মধ্যেও তা রয়েছে। আর এসব প্রবাহ বা চলাচলের কারণগুলোও উভয়ের ক্ষেত্রে প্রায় একই– যেগুলো আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। প্রবাহের নিয়ামক বা বাহকগুলো সেই একই– বায়ু প্রবাহ, পানি

প্রবাহ, উড়ন্ত প্রাণি, ভূমির প্রাণি, এবং মানুষ। তবে একই দৃশ্যপটের বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে যে রকম উড়ন্ত ও ভূমির প্রাণিদের ভূমিকাটি যথেষ্ট বেশি থাকে, বাতাসের ও পানিরও থাকে, বিভিন্ন দৃশ্যপটের মধ্যেকার প্রবাহে কিন্তু সেই প্রাধান্যগুলো বদলে যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয় মানুষের আর বাতাসের ভূমিকা– উড়ন্ত বা ভূমিতে চলা অন্যান্য প্রাণির ভূমিকাটিও গৌণ হয়ে যায়। পানির ক্ষেত্রে যদিও নদী প্রবাহের গুরুত্ব এক্ষেত্রেও থাকে, কিন্তু বাষ্পীভূত অবস্থার পানি জলীয় বাষ্প বায়ু প্রবাহে এক দৃশ্যপট থেকে অন্য দৃশ্যপটে যাওয়াটি আরো বেশি গুরুত্ব লাভ করে। অনেক প্রবাহের মূল নায়ক এক্ষেত্রে হয়ে পড়ে বাতাস – আর্দ্রতা, ধূলি কণা, কীট পতঙ্গ, বীজ, স্পোর, দূষণ, জলবিন্দু– অনেক কিছু। দৃশ্যপট থেকে দৃশ্যপটের নানা প্রভাবে মানুষের ভূমিকাটিও বেড়ে যায় অনেক খানি। মানুষ নিয়ে যায় নানা উদ্ভিদ, নানা প্রাণি, পানি, পুষ্টিদ্রব্য, নানা বস্তু ইত্যাদি। এগুলো সে নেয় সড়ক পথে, নৌপথে, আকাশ পথে– যেখানে যেভাবে সম্ভব। মানুষের কলকারখানা, কৃষি কাজ ইত্যাদিও নানা প্রবাহের সৃষ্টি করে। যেমন সেচ নালা ধরে পানি যায়, চিমনির থেকে ধোঁয়া যায় ইত্যাদি।

দৃশ্যপট সমূহের মধ্যে দূরপাল্লার প্রবাহে মানুষের ভূমিকা নিয়ে উপরে যা বলা হলো এক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বড় ভূমিকা মানুষ রাখছে শুধু সুদূরপ্রসারী তার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। সেই দু'হাজার বছর আগে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমে বসে সম্রাট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে পশ্চিমে বৃটেন বা স্পেন থেকে শুরু করে পূর্বে প্যালেষ্টাইন বা সিরিয়া পর্যন্ত প্রকাণ্ড ভূভাগে অনেক শহর-বন্দর নগরী গড়ে উঠেছে, তৈরি হয়েছে অনেক রোমান রোড, সৃষ্টি হয়েছে নূতন নূতন দৃশ্যপট। এক্ষেত্রে ঐ সিদ্ধান্তটি একটি ট্রিগার বা সুইচের কাজ করে সুদূরপ্রসারী দৃশ্যপট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এমনটি ইতিহাসে অনেক ঘটেছে, এখনো অহরহ ঘটছে। ব্রাজিলের রাজধানী ছিল রিয়ো-ডেজেনেরিও। সেখানে সরকারের একটি সিদ্ধান্ত হলো যে বহু দূরে আমাজন অববাহিকায় নির্মিত হবে ব্রাজিলের নূতন রাজধানী ব্রাসিলিয়া। ঐ একটি সিদ্ধান্তে হাজার কিলোমিটার দূরের ঐ জায়গায় আমাজন বনের দৃশ্যপট বদলে গেল, তৈরি হলো অনেক খানি ফাঁকা জায়গা, গড়ে উঠলো অনেক ভবন, সড়ক, কত কিছু।

অনেক সময় পাশাপাশি দুটি দৃশ্যপটের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয়। মানুষ-সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলশ্রুতিতে দেখা যেতে পারে যে একটি দৃশ্যপটের সম্প্রসারণ ঘটছে অন্য একটি দৃশ্যপটের বিনিময়ে। একদিকে হয়তো রয়েছে একটি শুষ্ক মরুময় দৃশ্যপট, তার পাশে সবুজ তৃণভূমি। শেষোক্ত ক্ষেত্রে মানুষের সিদ্ধান্তের কারণে যদি অতিরিক্ত পশুচারণ শুরু হয় তার ফলে পাশের পটভূমির শুষ্কতা একেও প্রভাবিত করবে এবং একে মরুময়তার দিকে নিয়ে যাবে। মানুষের এই প্রভাবটি উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় সর্বত্র আরো এক ভাবে দেখা যাচ্ছে। আগে শহর বা নগরের পরেই ছিল কৃষিভূমির দৃশ্যপট। শহরের কিনারায় হয়তো ছিল অল্প খানিকটা শহরতলী। এখন প্রায় সব জায়গায় এই শহরতলী বেড়ে চলছে, সেখানে তৈরি হচ্ছে আবাসিক এলাকা। কৃষিভূমির গ্রামের দৃশ্যপটকে সেখানে ক্রমেই ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে শহরতলীর দৃশ্যপট এসে। অবশ্য সেই শহরতলীর দৃশ্যপটকেও হয়তো এক সময় খেয়ে ফেলবে নগরীর বিস্তার। শান্ত আবাসিক এলাকা চলে যাচ্ছে নগরীর উচ্চ ভবন, যানবাহন আর কোলাহলের পেটে।

সমুদ্রের অনন্য দৃশ্যপট: প্রবাল দ্বীপ

প্রশান্ত মহাসাগরের ডুবো পর্বতে প্রবাল

প্রশান্ত মহাসাগরের তল থেকে উঠে এসেছে হাজার হাজার পর্বতে গড়া নানা দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী– যার অনেকগুলো সমুদ্রের ভেতরেই রয়ে গেছে। আর বাকি অনেকগুলোর শীর্ষ ভাগ পানির উপর জেগে উঠেছে দ্বীপ হিসেবে। এর মধ্যে আবার বেশ কিছু হলো এমন দ্বীপ যেগুলো একটি রিং এর মত দ্বীপ– রিং এর মাঝখানে শান্ত জলাশয় যাকে বলা হয় লেগুন আর দ্বীপটিকে বলা হয় এটল। এর ডুবা পর্বতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে প্রবাল প্রাচীর, বা প্রবাল দ্বীপ। এগুলো গড়ে ওঠে ক্ষুদ্র প্রবাল কীটের দ্বারা যারা ওখানে কলোনি গড়ে তোলে তাদের দেহের পাথুরে অংশ জমিয়ে ঐ দ্বীপ বা প্রাচীর গড়ে তোলে। প্রবাল কীটগুলো হলো মাত্র কয়েক মিলিমিটার আকারের সী-এনিমোন গোত্রের প্রাণি।

ডুবে থাকা ঐ সামুদ্রিক পর্বতগুলোর দৃশ্যপটকে স্থলের পর্বতের থেকে ঠিক বিপরীত ধরনের বলা যায়। স্থলের পর্বতের দৃশ্যপটে জীব সমৃদ্ধ অঞ্চল হলো ঢালের নীচের দিকের অংশ এবং তার পাদদেশ। সমুদ্রতলের পর্বতের সব চেয়ে লক্ষণীয় জায়গাগুলো হলো শৃঙ্গের কাছে সমুদ্র পৃষ্ঠের ঠিক উপরে বা ঠিক নিচের অংশগুলো যেখানে অত্যন্ত সমৃদ্ধ জীব বৈচিত্র গড়ে উঠেছে– বিশেষ করে প্রবাল দ্বীপের আশ্রয়ে। এর বাইরের দিকে যেখানে খোলা সমুদ্রের প্রবল ঢেউ আর স্রোত সব সময় এর উপর আছড়ে পড়ছে, তা সঙ্গে নিয়ে আসছে পুষ্টিদ্রব্য, অক্সিজেন যা উপরের এই জলমগ্ন ঢালকেও উদ্ভিদ আর প্রাণিতে সমৃদ্ধ করে তুলছে। তার জটিলতায় আর বৈচিত্রে প্রবাল দ্বীপগুলো স্থল বা জলের অন্য যেকোন দৃশ্যপটকে হার মানাতে পারে– এমনকি রেইন ফরেষ্টের দৃশ্যপটকেও। এর মূল অংশটি প্রবাল কীটের কলোনির এবং তার আশ্রিত অসংখ্য জীব প্রজাতিতে গড়া; সেখানে পানির তলায় বিচিত্র রূপে এদেরকে দেখা যায়। প্রবাল যে পাথরে জিনিস তৈরি করে তার আকারও বড় বিচিত্র। এদেরকে পাওয়া যায় গমের শীষ, মাশরুম, হরিণের শিং, বাঁধা কপি এবং এমনি নানা বিচিত্র জিনিসের আকৃতি ধারণ করা অবস্থায়, তাও আবার গোলাপি, বাদামি, সাদা– নানা রঙের নানা শেইডে। কোনটা সুইস চীজের মত বড় বড় ছিদ্রে ভর্তি, কোনটি কোকড়ানো মগজের মত,

কোনটা অর্গান পাইপের মতো নানা নলের সমষ্টি, ইত্যাদি অসংখ্য বৈচিত্রে দেখা যায় এদের।

প্রবাল দ্বীপে নানা আকৃতির ও রঙের প্রবালের সমারোহ

প্রবাল যেন খাদ্য গিলে খাওয়ার জন্য অসংখ্য মুখের সমষ্টি। তার অনেক- গুলোই প্রবাল কীটের নিজেদের মুখ। কিন্তু তার বাইরেও রয়েছে প্রবালের আশ্রিত অনেক ধরনের জীব– আলজি উদ্ভিদ থেকে শুরু করে নানা সাইজের বিচিত্র মাছ পর্যন্ত; তাদেরও যেন অনেক মুখ । ওরা সবই প্রবালের মধ্যে সৃষ্টি করে অসংখ্য খোপ খাপ। এরকম অনেক খোপ, অনেক ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে স্রেফ প্রাণিরা খুঁটে খুঁটে প্রবাল পাথর খেয়েছে বলে। শুধু একটি প্যারোট ফিশই বছরে ৫ টন পাথর খেয়ে গুড়ো করে ফেলতে পারে। আর ওসব খোপ খাপের ভেতর থাকা প্রাণির অনেক গুলো সমুদ্রের খাদ্য দ্রব্য ফিল্টার করে বেড়ে উঠে। এভাবে একটি ছোট পাথরের ছিদ্রগুলোর মধ্যেই হাজারো ক্ষুদ্র পোকার বাস থাকতে পারে। কাজেই প্রবাল দ্বীপের দৃশ্যপট হলো জীববৈচিত্র গিজ গিজ করা একটি দৃশ্যপট। এই পুরো বৈচিত্রকে দীর্ঘকাল স্থিতিশীল রাখতে হলে সমুদ্রেকে তুলনামূলক ভাবে শান্ত হতে হবে, নইলে ঢেউয়ের তোড়ে এর অনেক বিশদ গঠন ভেঙ্গে যেতে পারে। এ জন্যে লোহিত সাগরের মত শান্ত সমুদ্রে খুবই বৈচিত্রময় প্রবাল দেখা যায়। মনে রাখতে হবে যে এই যে পারস্পরিক আদান প্রদান এমনটি স্থলে-জলে আরো অনেক রকম দৃশ্যপটে দেখা যায়। যেমন মেরু

রিং এর আকৃতির প্রবাল দ্বীপ এটল, তার মাঝখানে শান্ত হ্রদ লেগুন

অঞ্চলে তুন্দ্রায় বল্গা হরিণ ভূমির সঙ্গে লেপটে থাকা যে লাইকেনের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করে তা কিন্তু একেবারে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে মিশে থাকা এক রকম ফাঙ্গাস ও আলজির সমন্বয়, যা পরস্পরকে সহায়তা দিয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায়ও টিকে থাকতে পারে।

প্রবাল গঠিত হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রবাল কীটের দ্বারা

প্রবাল কীটের এই সব সহযোগী জীব তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে কী ভাবে যায়? কীটের পরবর্তী প্রজন্ম শুরু হয় লার্ভার মাধ্যমে সহযোগী জীবরা কোন কোন ক্ষেত্রে জন্ম স্থানেই লার্ভার সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করে। তবে সেটি সব ক্ষেত্রে হয়না। এ লার্ভার একটি প্রবাহ প্রবাল কলোনি থেকে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে– এমনি করেই কলোনি বিস্তৃত হয়। সেক্ষেত্রে সমুদ্রের পানির প্রবাহের সঙ্গেই সেই ঘনিষ্ট সঙ্গী জীবদেরও বীজ নূতন প্রজন্মের প্রবাল কীটের কাছে যায়। ওরা পানিতে একাকী থাকতে পারে বটে– কিন্তু তা তাদের কঠিন জীবন। তাই প্রবাল কীট বা অনুরূপ আরো কিছু জীবের আশ্রয়ে যাওয়াই তাদের জন্য মঙ্গল।

প্রবাল দ্বীপে আর চলে নানা সামুদ্রিক জীবের চলাচল। ঐ যে প্রবালে অসংখ্য খোপ খাপ যেখানে তারা পায় ভাল আশ্রয়; আর অঙ্গাঙ্গিক সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে প্রবাল কীট যে প্রচুর পুষ্টিদ্রব্য তৈরি করে তারও ভাগ পায় তারা। হাজার হাজার প্রজাতির স্কুইড, ঝিনুক, শামুক, আর বিচিত্র রকমের মাছের আস্তানা হয়ে উঠে প্রবালের এই জগত। এ জন্যই সামুদ্রিক যত দৃশ্যপট আছে তার মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধ, সব চেয়ে জীবন্তগুলোর একটি হলো প্রবাল দ্বীপ ও প্রবাল প্রাচীর।

তার যথেষ্ট স্থিতিশীল ইকোসিষ্টেম সত্বেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রবাল দ্বীপগুলোর ভাগ্যে প্রায় নিয়মিত ভাবেই জুটেছে বড় বিপর্যয়ের ধ্বংস যজ্ঞ। ঐ জায়গাটি হলো কিছু সময় পরপরই সমুদ্র তলের ভূকম্পন ও সুনামিতে আক্রান্ত অঞ্চল। তারপর পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকা উপকূল এবং পশ্চিমে এশিয়ার উপকূলের মধ্যে কিছু বছর পর পর নিয়মিত জলবায়ু আবর্তনে সৃষ্টি এলনিনো নামে পরিচিত আরেকটি ঝড়ো বিপর্যয়। প্রবালের শান্ত স্থিতিশীলতাকে এরা একেবারেই উল্টো পালটে দেয়। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানব সৃষ্ট বিপর্যয়। সেই পাল তোলা জাহাজে ইউরোপীয়রা যখন এসব প্রবাল দ্বীপে প্রথম যাওয়া শুরু করেছিল, তখন থেকেই এমন বিপর্যয়ের শুরু। ওরা ওখানে নির্ভয়ে বেড়ে ওঠা সামুদ্রিক কচ্ছপদের কলোনিকে ধ্বংস করেছে জাহাজের কথিত ক্ষতি হবে মনে করে। ফলে উপকূলের যে সমৃদ্ধ ঘাস সামুদ্রিক কচ্ছপের পেটে যেতো তা এখন অবারিত ভাবে বেড়ে পঁচে এখানকার পানিকে দূষিত করে প্রবাল কীট মেরে ফেলছে। তাতে শুধু কীট ধ্বংস হয়নি তার সঙ্গে লোপ পেয়েছে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্রের পুরো দৃশ্যপট।

সাম্প্রতিক কালে প্রবাল দ্বীপগুলোতে পর্যটকদের ভিড় বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ বিপর্যয়ের তীব্রতা বেড়ে গেছে। ইতোমধ্যে এসব বহু প্রবাল দ্বীপে মাছ শিকারের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত। ফলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ সী-উইড খাওয়ার মাছ যখন রইলোনা তখন সী-উইড খেয়ে সীমিত রাখার দায়িত্ব নিয়োছিল আর এক সামুদ্রিক জীব সী-আরচিন। কিন্তু ১৯৮০'র দশকের মাঝামাঝি এসে কোন এক মহামারীতে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের সী-আরচিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ফলে এবার সী-উইড বেড়েছে অপ্রতিরোধ্য ভাবে। উপকূলের কাছে পুরো জায়গা এদের জঙ্গলে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রবাল কীটের কলোনি ঢাকা পড়ে ছায়ার কারণে কীট মরে গিয়েছে দলে দলে। তাদের যে লার্ভা তারাও সী-উইডের কারণে দূরে গিয়ে কোথাও স্থিত হয়ে নূতন কলোনি করতে পারেনি। উদাহরণ স্বরূপ গত শতাব্দীর শেষ দশকে এসে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের নয়-দশমাংশ প্রবাল কলোনি সামুদ্রিক উদ্ভিদের পুরো মাদুরে ঢাকা পড়ে সমাধিস্ত হয়ে গিয়েছিল। পর্যটন এবং প্রবাল-রত্ন বাণিজ্য প্রবাল দ্বীপ ও প্রবাল প্রাচীরগুলোর পরিস্থিতি আরো বিপন্ন করে তুলেছে। পর্যটনে মানুষের ভিড় বাড়ায় দূষণ বেড়েছে। এর ফলে এখানকার নাজুক প্রাথমিক জীব জু-জ্যানথালি নষ্ট হয়ে প্রবাল তার বর্ণাঢ্য শোভা হারাচ্ছে। প্রবাল কীটের সঙ্গে একত্র বাসকারী এই ক্ষুদ্র প্রাণি জু-জ্যানথালির কারণেই প্রবালে নানা রঙ দেখা দেয়। অন্য দিকে পর্যটন এবং ঘর সজ্জার চাহিদার কারণে ভেঙ্গে আনার ফলেও প্রবাল নষ্ট করা হচ্ছে।

আমরা দেখেছি সাধারণ অবস্থায় যে কোন দৃশ্যপট বিপর্যয়ের পর ধীরে ধীরে আবার পুনরায় স্থিতি লাভ করে। কিন্তু ইতোমধ্যে যদি এর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তা হলে এই স্থিতি আর সহজে ফিরে আসেনা। ক্যারিবীয় অঞ্চলের হারিকেন ঘূর্ণিঝড়গুলো যখন প্রবাল দ্বীপের উপর আঘাত হেনেছে, সেই আঘাত থেকে তারা উঠে আসতে পারেনি। বিষয়টি এখন নানা দেশের ও বিশ্ব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অষ্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার রীফ নামক প্রধান প্রবাল প্রাচীর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলোর অন্যতম। এটিও খুবই গুরুতর ধরনের সম্মূখীন হয়েছে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট বিপর্যয়ের মুখে। ধ্বংস এড়াতে একে সামুদ্রিক রিজার্ভ পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ১৯৭৫ সালেই। ইতোমধ্যে একে বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল হিসবেও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। শুরুতে এর মোট অংশের মাত্র বিশ ভাগের এক ভাগ সংরক্ষিত করা হলেও পরে এর এক তৃতীয়াংশে মাছ ধরা একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে জীবন্ত প্রবাল ভাঙ্গা ও সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এখানে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে শিল্প বর্জ্য সমুদ্রে যাওয়াও সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছে। যেখানেই এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেখানেই সোণা ফলেছে –প্রবালের অবক্ষয় কমে এসেছে। আরো বড় কথা এখানে প্রবাল দৃশ্যপটের বিপর্যয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েছে অনেক, আর স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয় সময়ও কমে গেছে নাটকীয় ভাবে।

মানুষের সব কার্যক্রম যে অবশ্য প্রবাল দৃশ্যপটের বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তা বলা যাবেনা। অনৈচ্ছিক ভাবে মানুষ প্রবালকে যেমন বিপর্যস্ত করেছে তেমনি নূতন প্রবাল কলোনি সৃষ্টির সুযোগও করে দিয়েছে প্রায়শ অনৈচ্ছিক এবং কাকতালীয় ভাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নৌযুদ্ধের ফলে সমুদ্রে ডুবে গেছে এমন অনেক জাহাজ পরে সমৃদ্ধ প্রবাল কলোনির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং ইতোমধ্যে চমৎকার প্রবাল প্রাচীরে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরে কোরাল সাগরের বিখ্যাত নৌযুদ্ধে যে অনেকগুলো জাহাজ ডুবেছিল সেগুলো এদিক থেকে দারুণ এগিয়েছে। আরো সম্প্রতি মেক্সিকো উপসাগরের অনেকগুলো তৈল আহরণ পাটাতন কাজ শেষে পরিত্যক্ত অবস্থায় কাৎ করে ডুবিয়ে দেয়ার পর চমৎকার ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপে পরিণত হয়েছে।

দৃশ্যপট ব্যবস্থাপনা

মানুষের অগ্রাধিকার

প্রবাল দ্বীপের অবক্ষয়ের বিষয়টি থেকে আমরা দেখেছি মানুষ এর ধ্বংসের ক্ষেত্রে যেমন অবদান রেখেছে, তেমনি আবার কোথাও কোথাও প্রবালের এই অবক্ষয় প্রতিরোধ করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছে – যেমন মাছের শিকার নিয়ন্ত্রণ করে, প্রবাল পাথর ভাঙ্গা নিষিদ্ধ করে। শুধু তাই নয় নূতন প্রবাল দ্বীপ গড়ার জন্য কৃত্রিম ভিত্তিমূল তৈরির ব্যবস্থাও মানুষ করছে। এমনি করে অন্যান্য বিভিন্ন কাম্য দৃশ্যপট রক্ষার জন্য ও সৃষ্টির জন্য মানুষের ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। সুদূর অতীত থেকেই মানুষ নিজের পরিবেশকে যেখানে সম্ভব নিজের মত করে গড়ে নেবার চেষ্টা করেছে, আর সেটি করতে গিয়ে দৃশ্যপটের ব্যবস্থাপনা করেছে। অন্য কোন প্রাণি এটি করার চেষ্টা খুব একটা করেনা।

অতীতে বিভিন্ন সময় যে দীর্ঘ হিমযুগ মানুষকে দারুণ ভাবে বিপর্যস্ত করেছিল, তার মধ্যে সর্বশেষটির অবসান হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার বছর আগে। এই হিমযুগের শেষে মানুষ যখন আবার যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছে, নিজেদের উন্নয়নে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেষ্ট হয়েছে, তখনকার সময়ের কিছু নিদর্শন ইউরোপে পাওয়া গেছে। সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে দৃশ্যপটের বিভিন্ন উপাদানকে তারা এমন ভাবে নিজেদের সুবিধামত মিশ্রিত করেছে যাতে নিজেদের জন্য সর্বোত্তম বসত গড়ে তোলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ উত্তর ফ্রান্সে তখনকার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে যেখানে দেখা যায় যে মানুষ তাদের বসত স্থাপন করেছে দুটি করিডরের মিলন স্থলে– চলাচলের একটি পথ যেখানে মাছ সমৃদ্ধ একটি ছোট নদী ছেদ করে গেছে ঠিক সেখানে। ওরা দেখেছে এই পশু আর ঐ মাছের কিছু কিছু তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেও ওখানকার স্থিতিশীলতায় কোন অবনতি হয়না। আবার কৃষি শুরু করার পর কোথাও দেখা গেছে যে নিজেদের গ্রামগুলোকে মানুষ স্থাপন করেছে বনের পটভূমির ভেতরে কিছু কিছু জায়গা বনমুক্ত করে নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই গ্রামের টুকরার সংলগ্ন ছিল চাষের জমির টুকরাগুলো। যেখানেই এগুলো ছিল তার চারিদিকে ছিল আরো কিছু খোলা চারণ ভূমি যে তৃণক্ষেত্রে

মানুষের পোষা পশুগুলো চরানো হতো। তারও বাইরে ছিল বনভূমির পটভূমি যেখান থেকে মানুষের নির্মাণ সামগ্রী আর জ্বালানি আসতো।

মধ্যযুগে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত ভেনিস নগরী যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতেও আমরা দেখি কী ভাবে মানুষ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যপটের সুযোগ নিয়েছে এবং বিসদৃশ দৃশ্যপটের এই অন্তরঙ্গ নৈকট্যকে বাড়িয়ে তুলতে নিজের চেষ্টাও যোগ করেছে। ভেনিসে নগরীটিকে স্থাপন করা হয়েছে দ্বীপ ও লেগুনের মাধ্যমে সমুদ্র যেখানে স্থলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে কাছে এসে দৃশ্যপটে চরম বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে ঠিক সেখানে। এতে সমুদ্র আর স্থল একে অন্যকে জটিলভাবে জড়িয়ে রেখেছে– পূর্ণ লবণাক্ত পানি, ঈষৎ, লবণাক্ত পানি, এবং স্থলের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের সকল সুযোগ মানুষ এখানে ব্যবহার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ওরলীয়ন্স নগর সহ আরো বেশ কিছু ঐতিহ্যবাহী নগরীর এ বৈশিষ্ট আছে। তাছাড়া আজকের দুনিয়ার দশটি বৃহত্তম নগরীর আটটিই স্থাপিত হয়েছে সমুদ্র তীরে– মূলত ঐ একই কারণে। স্পষ্টত মানুষ এখানেও দৃশ্যপট বৈসাদৃশ্যের সুযোগ নিয়েছে নিজেদের দৃশ্যপট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বৈসাদৃশ্য বাড়িয়ে তুলতে অবদান রেখেছে।

এ সবের মধ্যে মানুষের যে চেষ্টাটি মুখ্য হয়ে উঠে তা হলো দৃশ্যপটের জীববৈচিত্র যে উৎপাদন করে তাতে ভাগ বসানো। সেই ভাগ বসানো যদি মাত্রাতিরিক্ত না হয় তা হলে দৃশ্যপটের ভারসাম্যে হয় পরিবর্তন আসেনা, অথবা পরিবর্তন আসলেও শিগ্‌গির তা পুনরুদ্ধার হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। মানুষ যখন উদ্ভিজ উৎপাদন নিজের ভোগে লাগায় সাধারণত ভারসাম্য বড় রকমে বদলায়না, উদ্ভিদ শিগ্‌গির আবার গজাতে পারে। উদ্ভিদের বিভিন্ন পর্যায়ে যে বন্টন এটি শিগ্‌গির পূর্বাবস্থা পায়। কিন্তু মানুষ দৃশ্যপট থেকে যদি প্রাণিকে নিজের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে, তখন বিষয়টি এত সরল থাকেনা। ঐ প্রাণির প্রজনন ক্ষমতাপূর্ব, প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং প্রজনন ক্ষমতা উত্তর সংখ্যাগুলোর মধ্যে আগে যে অনুপাত ছিল, মানুষের আহরণের ফলে ঐ অনুপাত খুব সম্ভব বদলে যাবে। প্রজনন-ক্ষম প্রাণি অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ঐ প্রাণির সংখ্যায় রীতিমত বিলুপ্তির আশংকা নেমে আসতে পারে। বিশেষ করে মাছ শিকারের ক্ষেত্রে এটি আমরা অহরহ দেখছি– যে জন্য প্রজননকারী ইলিশ ধরা আমাদের দেশে নিষিদ্ধ করা হয় মাঝে মাঝে।

ব্যবস্থাপনার দ্বারা দৃশ্যপটের ভারসাম্য যে যথেষ্ট অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব এটি আমরা বেশ কিছু দিন ধরে ভালই উপলব্ধি করছি। এক একটি দৃশ্যপটকে এভাবে আমরা চির সজীব করে রাখতে পারি, অন্তত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়িয়ে তাকে যথাসম্ভব উৎপাদনশীল রেখে দিতে পারি, এমনকি উৎপাদন ক্রমে বাড়িয়েও চলতে পারি। এর একটি চাবিকাঠি হলো নবায়নযোগ্যতা। ফসিল জ্বালানি, এর দ্বারা সৃষ্ট রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা নির্দিষ্ট দৃশ্যপটের উৎপাদনশীলতার একটি ব্যবস্থাপনা বেশ কিছু দিনের জন্য চালাতে পারি বটে, কিন্তু সেই ব্যবস্থাপনা দীর্ঘস্থায়ী হবেনা। এর জন্য আর্থিক, পরিবেশিক, ও সামাজিক মূল্যটি অনেক বেশি দিতে হবে। কিন্তু সালোক সংশ্লেষণে ও অন্যান্য ভাবে সূর্যের শক্তি ব্যবহার করে এই নবায়নযোগ্যতা সৃষ্টি করা যায়। তাছাড়া দৃশ্যপটের সম্পদ আহরণের পদ্ধতি, পরিমিতি, পরিকল্পনা ইত্যাদির মাধ্যমেও এই নবায়নযোগ্যতা সৃষ্টি করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ কোন গাছগুলো কাটবো, কতগুলো কাটবো, কোন মাছগুলো এবং তার কতগুলো শিকার করবো– সেই পরিকল্পনা এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

দৃশ্যপটের ব্যবস্থাপনা: মাটির ক্ষয় রোধ করাবার জন্য ধাপ-চাষের ব্যবস্থা

নানা দৃশ্যপটের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

মানুষ সাধারণত সে সব দৃশ্যপটের ব্যবস্থাপনায় আগ্রহ দেখায় যেগুলো সে ব্যবহার করে– যেমন ব্যবহারযোগ্য বনভূমি বা কৃষিজমি, বা বসত সমন্বয়ে যে সব দৃশ্যপট। কিন্তু তার বাইরে রয়ে গেছে প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত নানা অব্যবহৃত দৃশ্যপট– মেরু অঞ্চলের তুন্দ্রা, উত্তরে সাইবেরিয়া, কানাডা ইত্যাদি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বন, মরুভূমি, অব্যাহত তৃণভূমি ইত্যাদি। এ ধরণের বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্যপটগুলো সাধারণত প্রধান লোক বসত এবং অনুকূল আবহাওয়া অঞ্চল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত– তাই সুদূর উত্তরাঞ্চলে বা দক্ষিণাঞ্চলেই এগুলোর আধিক্য দেখা যায়; অথবা কোন কোন নিরক্ষীয় গহীন রেইন ফরেষ্টের আওতায়। অন্যদিকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, চারণ তৃণভূমি, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ইত্যাদিতে এমন অব্যবহৃত বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্যপট নেই বল্লেই চলে।

মানুষের প্রত্যক্ষ ব্যবহারে না থাকলেও এমন দৃশ্যপটে যে মানুষের ব্যবস্থাপনা যে একেবারে নেই এমনটি বলা যাবেনা। ঐ প্রাকৃতিক অবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্য, এর স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থাপনা নেয়া হয়। কিছু কিছু ভ্রমণ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনেও এই প্রাকৃতিক দৃশ্যপটগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এ সব তুলনামূলক ভাবে চরম আবহাওয়ার জায়গায় নানা দিক মানব-ব্যবস্থাপনার হস্তক্ষেপের প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল হবার কথা। তাই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনাকে হতে হয় খুব সন্তর্পনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে– অনেকটা হালকা ভাবে। মানুষের ব্যবহার্য দৃশ্যপটে যে ভাবে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ব্যবস্থাপনা করা হয়, এখানে তা অচল। এখানকার দৃশ্যপটে নানা উপাদানের মধ্য দিয়ে শক্তি, পানি, পুষ্টিদ্রব্যের প্রবাহ, এবং প্রাণি ও উদ্ভিদ চলাচলের প্রকৃতিও জানতে হয় এমনি হালকা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। যে করিডরগুলো এ চলাচলে ব্যবহৃত হয় তার নিরবিচ্ছিন্নতা যেন বজায় থাকে, এদের মধ্যে জালিকার মত সংযোগ ব্যবস্থাগুলোতে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে হয়। মানবসৃষ্ট বিপর্যয় না থাকলেও আগুণ, ঝড়, বন্যা, কীট আক্রমণ ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এ দৃশ্যপটকেও হুমকিতে ফেলে দেয় প্রায়শই। কিন্তু এক্ষেত্রে মানব-প্রতিক্রিয়াটি হবে প্রতিরোধ নয়, বরং বিপর্যয়কে স্বাভাবিক হিসেবে নিয়ে তার মধ্যেই সর্বোত্তম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। ফলে আমাদের ব্যবহার্য দৃশ্যপটে

যা আমরা করবো– সে ভাবে বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ তৈরি, আগুণ দমনে নির্বাপক ব্যবহার, কীটের আক্রমণ রোধে কীটনাশক ছড়ানো– এসব এখানে আমরা করবো না, করতে বাধ্য হলেও তা ন্যূনতম রাখবো।

বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের থেকে আমরা ব্যবহার্য একটি দৃশ্যপটে আসি। যেমন ব্যবহারে আছে এমন বনভূমির কথাই আগে ধরা যাক। এর ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে মানুষের সংখ্যা আর বনের আয়তনের অনুপাতের উপর। জন- সংখ্যার তুলনায় বনের আয়তন যদি অনেক বড় হয় তা হলে সময় সময় কিছু গাছ কেটে তা নিয়ে যাওয়া যায়, তারপর বেশ কয়েক বছর হয়তো বনে আর হাত দিতে হয়না। কিন্তু বনের আয়তনের তুলনায় ভোক্তা জনসংখ্যা যদি বেশি হয়, তা হলে চিত্রটি পাল্টে যায়। গাছ ঘন ঘন কাটতে হয় বলে, এবং কাটা জায়গায় নূতন গাছ নানা বয়সেরগুলো নানা জায়গায় থাকে বলে বিভিন্ন বয়সের গাছের মোজাইক সৃষ্টি হয়। এতে নানা বয়সের গাছের দ্বারা এক একটি টুকরা, করিডর ইত্যাদি দৃশ্যপট উপাদানের সৃষ্টি হয়। এরকম প্রত্যেক টুকরার জন্য বন ব্যবস্থাপনার কিছুটা ভিন্ন কৌশল নিতে হতে পারে। যেমন সব চেয়ে পাকা গাছগুলোকে কাটা হয়। আবার নূতন গজানো গাছের দ্বারা সৃষ্টি

বন ব্যবস্থাপনা

টুকরাগুলোতে গাছ যখন ঘন হয়ে উঠে তখন তাদের মাঝখান থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল গাছগুলোকে উপড়ে ফেলা হয়– গাছের ঘনত্ব কমিয়ে দেয়ার জন্য। কাছাকাছি বয়সের টুকরাগুলো সাধারণত বনের একই দিকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়– যাতে একবার ঐ দিকে গাছ কাটা আরম্ভ করলে সামনের বেশ কিছু বছরগুলোতেও ঐ দিকেই কাটা যায়, কারণ তাতে গাছ কাটা ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়– রাস্তা ইত্যাদির উন্নয়ন করে। এসবের ফলে সার্বিক ভাবে দেখলে বনের দৃশ্যপট আর সমসত্ত্ব থাকেনা, বরং এক এক দিকে এক রকম থাকে।

গাছ কাটার চাহিদা যদি এত বেশি হয় যে একই সঙ্গে এর বিশাল অংশ কাটতে হয় তা হলে দৃশ্যপটটি আর মোজাইক না হয়ে বরং সমসত্ত্ব হবে। সাধারণভাবে মোজাইক বা সমসত্ত্ব ব্যবস্থাপনা কোনটি হবে তা অনেকটা নির্ভর করে বিপর্যয়ের কমবেশি হবার উপর। যদি খুব ব্যাপক ও তীব্র বিপর্যয় হয়– বড় ঝড়, বড় আগুণ, কিংবা কীটের উপদ্রব ইত্যাদি, তা হলে পরবর্তী ব্যবস্থাপনা সমসত্ত্ব হবার দিকেই গড়াবে– ধ্বংসের ব্যাপকতায় সর্বত্র সব গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে নূতন ভাবে গজাতে হবে একই রকম সর্বত্র। বিপর্যয়ের ব্যাপকতা যদি কম হয় তা হলে এখানে ওখানে স্থানীয়ভাবে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত গাছ থাকবে, সে সব জায়গায় নূতন গাছের ও অন্যত্র পুরানো গাছের টুকরার মোজাইকের দিকে গড়াবে ব্যবস্থাপনা– তবে সেটি হবে কিছুটা মোটা দাগের মোজাইক। বিপর্যয় যদি আরো কম ব্যাপক ও কম তীব্র হয় তা হলে তা হবে একবারেই স্থানীয় প্রকৃতির– এখানে একটি দুটি গাছ, আবার দূরে ওখানে একটি দুটি গাছ হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোনটি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, কোনটির শুধু পাতা নষ্ট হয়েছে, তা হলে প্রাকৃতিক ভাবেই বনের সর্বত্র নানা বয়সের মিশ্র গাছ থাকবে। সেক্ষেত্রে বন ব্যবস্থাপনাকারীদের সামনে দুটি বিকল্পই খোলা থাকবে– পুরো বনটিকে একই ভাবে সমসত্ত্ব করে গড়ে তোলার, অথবা বিভিন্ন বয়সী গাছের মোজাইক সৃষ্টির। আসবাব তৈরির উন্নত পাকা কাঠের যোগান দিতে যে বনভূমি তার ব্যবস্থাপনার সামনে একটি বড় লক্ষ্য হলো বিভিন্ন বয়সী গাছের যথেষ্ট প্রাপ্তি– যাতে সব চেয়ে পরিপক্কগুলোকে কাটলে সেখানে একেবারে নূতন বীজ অঙ্কুরোদগম করতে পারে, কিন্তু অন্যত্র বিভিন্ন বয়সী গাছ থাকছে যার কোনটি একটু পরেই পরিপক্ক হবে, আবার কোনটি তার পর। ফলে সব সময় সরু কাণ্ডের গাছ থাকবে অনেক বেশি। এরপর যেসব গাছের কাণ্ডের ব্যাস যত বেশি হবে তাদের সংখ্যা হবে তত কম, আর সব

চেয়ে মোটা কাণ্ডের গাছ থাকবে অল্প সংখ্যক। ব্যবস্থাপনার এই লক্ষ্য নিয়ে এগুতে হলে ওখানকার মাটি, পানি সব কিছু সহ ইকোসিস্টেম সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের উপাত্ত থাকা প্রয়োজন। আজ ওখানে সমসত্ত্বতার যে অভাব অর্থাৎ স্থানীয় বৈসাদৃশ্যগুলো দেখা যাচ্ছে বহু বছরের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনার দ্বারা তা প্রভাবিত হতে বাধ্য। সেগুলো বিবেচনায় রেখেই আজকে ব্যবস্থাপনা চলতে হবে।

কৃষি দৃশ্যপটের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক এক ধরনের দেশে এক এক রকম হবে সেটিই স্বাভাবিক। আমাদের কৃষির প্রায় পুরোটাই এখন শস্য নির্ভর – দুটি তিনটি মৌসুমে ফসল ফলানো যায় একের পর এক। এক সময় শুকনা মৌসুমে রবি শস্য হতো, জমি পতিতও রাখা হতো পালাক্রমে – এখন তেমনটি বিশেষ হয়না। নাতিশীতোষ্ণ ইউরোপ আমেরিকার অনেক জমির অধিকারী কৃষককে একই সঙ্গে কৃষিজমি, চারণ ভূমি ও বৃক্ষ শোভিত বনভূমি নিয়ে কাজ করতে হতে পারে। এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য আনা ব্যবস্থাপনার একটি বড় লক্ষণ। আর একটি লক্ষণ হলো শস্য আবর্তন ও জমি পতিত রাখার ব্যাপারটি কেমন করে চলছে সেটি। আবার দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে দক্ষিণে প্যাটাগোনিয়ায় শীতল শুষ্ক পরিবেশে খোলামেলা দৃশ্যপটের এখানে ওখানে অল্প ঝোপ বা তৃণ ভূমি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় কৃষককে। তার ব্যবস্থাপনাকে হিমশিম খেতে হয় ব্যাপক পশুচারণের বিরূপ লক্ষণ সৃষ্টির বিরুদ্ধে। কৃষিভূমির সঙ্গে মানুষের তৈরি স্থাপনা কী রয়েছে তাও ব্যবস্থাপনার কিছু সুস্পষ্ট লক্ষণ তুলে ধরে। আমাদের দেশে যদি সেখানে থাকে একটি গভীর নলকূপের পাম্পঘর অথবা শ্যালো পাম্পের ঝুপড়ি আমরা আন্দাজ করতে পারি সেখানে সেচ দিয়ে বোরো ধানের আবাদ হচ্ছে। অথবা অন্য দেশে যদি দেখি ঘাস সংরক্ষণের বিস্তৃত শেড ও খড়ের গাদা বুঝবো পশু খাদ্যের জন্য খড়ের চাষই এই জমির উপজীব্য। ফ্রান্সের বোর্দো অঞ্চলের মত জায়গায় যদি দেখি জমির কাছে ওয়াইন সংরক্ষানাগারের দীর্ঘ সারি তা হলে বুঝবো আঙ্গুরের বাগানই এখানকার চাষাবাদের লক্ষ্য। উপরে সবগুলো ক্ষেত্রে দেখলাম দৃশ্যপটের যে গঠন একদিক থেকে তাতে ব্যবস্থাপনার লক্ষণগুলো যেমন ফুটে উঠে অন্য দিকে তাতে ব্যবস্থাপনার সুযোগগুলোও ধরা পড়ে। তাই জমির আকৃতি, দৃশ্যপটের উপদানগুলোর জালিকা– যেমন আইলের বা ঝোপ সারির করিডরগুলোর প্রশস্ততা বা পারস্পরিক সংযোগ, এসবে বিপর্যয়ের

আলামতগুলো, বিভিন্ন জীবের চলাচলের পথ–ব্যবস্থাপনার লক্ষণ ও সুযোগগুলো এই সবের সঙ্গেই জড়িত।

বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্যপট, বনাঞ্চলের দৃশ্যপট এবং কৃষি দৃশ্যপটের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমনটি দেখলাম অন্য যে কোন দৃশ্যপটের ক্ষেত্রে তা হতে পারে। যেমন মানুষ যখন নিজের গ্রাম, শহর, নগর ইত্যাদির দৃশ্যপট গড়ে সেখানকার ব্যবস্থাপনাও দৃশ্যপটের গঠন বা উপাদানগুলোর সঙ্গেই জড়িত। আমরা হয়তো সব সময় বিষয়টি ওভাবে ভেবে দেখিনা, কিন্তু দৃশ্যপটের ইকোলজিটি বা আরো স্পষ্ট ভাবে দৃশ্যপটের অন্তরালে কী রয়েছে তা এ সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে, এগিয়ে নিয়ে যায়। অসমসত্ত্বতা বা বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ, উপাদানগুলোর মধ্যে নানা প্রবাহ, দৃশ্যপটে পরিবর্তন– এ সবকে হিসেবের মধ্যে না নিয়ে ব্যবস্থাপনার কোন সুযোগ নেই– না বন ব্যবস্থাপনায়, না কৃষি ব্যবস্থাপনায়, না নগর ব্যবস্থাপনায়। আমরা দৃশ্যপটের গুণগত মান যাচাই করতে পারি যার যার সুবিধামত– প্রায়শ তাদের খাদ্যের প্রাপ্তি, সুবিধাজনক স্থানীয় ক্ষুদ্র-জলবায়ু ইত্যাদির বিবেচনায়। সব মিলে কাম্য ও অকাম্য দৃশ্যপটের মধ্যে একটি সাধারণ পার্থক্য ফুটে উঠে বৈকি। আজকের প্রবণতার মধ্যে এক দিকে যেমন আমরা প্রকৃতির অধিকতর অবক্ষয় হতে দেখছি, কাম্য দৃশ্যপটের বিনষ্টির মাধ্যমে; অন্যদিকে সেই অবক্ষয় রোধে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাও দেখতে পাচ্ছি বিশ্ব সমাজের মধ্যে। দৃশ্যপট ব্যবস্থাপনাও তাই ক্রমাগত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

ব্যবস্থাপনার জন্য মডেলিং

গণিত এবং কম্পিউটার ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বহু ধরনের কাজে মডেলিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। যেমন যে রকম নির্ভুলতার সঙ্গে আজকাল আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেয়া সম্ভব হচ্ছে তা, অথবা আগামী ৫০ বা ১০০ বছর পর জলবায়ু পরিবর্তন কী পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে, অথবা জীববৈচিত্র সামনে কী হারে বিলুপ্ত হবে বা আরো কত নূতন প্রজাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে– ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এরকম মডেলিং এর সাহায্য ছাড়া দেয়া প্রায় অসম্ভব হতো। মডেলিং এর অর্থ হলো এক একটি বিষয়ে বিজ্ঞানের আনুসঙ্গিক সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও নিয়মগুলোকে একত্র করে

ব্যাপারটি কী ভাবে কাজ করে তার একটি কম্পিউটার সফ্টওয়্যার তৈরি করা। এতে বিভিন্ন বিকল্প দৃশ্যকল্পের (সিনারিও) ব্যবস্থাও থাকতে পারে– যেমন পরিস্থিতি এরকম হলে এটি কীভাবে কাজ করবে, বা পরিস্থিতি ওরকম হলে কী ভাবে কাজ করবে ইত্যাদি। এখন বর্তমান পরিমাপলব্ধ উপাত্তগুলো এই মডেলে দিয়ে দেয়া হলে বিশেষ একটি দৃশ্যকল্পের জন্য মডেল তার আউটপুট বা ফলাফলটি দিয়ে দিতে পারবে। যেমন দৃশ্যপটের মডেল যদি আমরা করতে চাই তা হলে এই বইয়ে আমরা দৃশ্যপটের যত আলোচনা করেছি যে সবের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক নিয়ম ও ফর্মুলাগুলো মডেলে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এখন পরিমাপ থেকে ইনপুট উপাত্তগুলো দিতে পারি– যেমন আবহাওয়ার উত্তাপ, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির উপাত্ত, মাটির গুণাগুণের উপাত্ত, উদ্ভিদ ও প্রাণি সম্পর্কিত উপাত্ত, দৃশ্যপটের টুকরা, করিডর ইত্যাদি উপাদান সম্পর্কে উপাত্ত, নানা জিনিসের প্রবাহ ও চলাচল সংক্রান্ত উপাত্ত, বৃদ্ধি অবক্ষয় ইত্যাদি সম্পর্কে উপাত্ত– ইত্যাদি, যেখানে যা যা প্রাসঙ্গিক। মডেলটি কী উদ্দেশ্যে তৈরি করেছি তার উপরেই নির্ভর করবে আউটপুট বা ফলাফলে কী ধরনের জিনিস চাইবো তা? যেমন দৃশ্যপট ব্যবস্থাপনার জন্য যদি মডেলটি করে থাকি, তা হলে তার থেকে আমরা আশা করবো ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া বা পরিমাণ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ– যাতে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাটি কী ভাবে করলে সর্বোত্তম ফলাফল আমরা পেতে পারি।

দৃশ্যপটের ক্ষেত্রে মডেল তৈরির একটি বড় ভিত্তি হলো দৃশ্যপটের ব্যাপক ম্যাপিং– এটি শুধু সাধারণ অর্থে ছবির মত ম্যাপ নয়, বরং দৃশ্যপটের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্টগুলোর স্থানিক ও কালিক বন্টন ধারণ করে একই দৃশ্যপটের পরস্পর উপরিপাতিত হবার মতো বহু রকমের ম্যাপ। যেমন এ ক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট, ভূমির উচ্চতা বৈচিত্র, মাটির গুণাগুন, পানির অবস্থান ও প্রবাহ বৈশিষ্ট, জলবায়ু বৈশিষ্ট, উদ্ভিদ ও প্রাণি বৈচিত্র, ভূমি ব্যবহার, নানা উপাদানে বিভক্তি, বিভিন্ন সমীক্ষা বা জরীপ লব্ধ প্যটার্ণ ইত্যাদি অনেক কিছুর ম্যাপ প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এই ম্যাপগুলো মডেলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট হবে। এ সংক্রান্ত একটি মডেল তৈরি করতে গেলে পর পর বেশ কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে তা করতে হবে। প্রথমেই ঠিক করতে হবে মডেলটির উদ্দেশ্য কী। দ্বিতীয়ত দেখতে হবে এর কী কী আলাদা অংশ রয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী– যেমন দৃশ্যপটের উপাদান বিন্যাস ও তাদের

মধ্যে নানা প্রবাহের কী সম্পর্ক। তৃতীয়ত বিভিন্ন অংশগুলোকে ঐ সম্পর্কের ভিত্তিতে আপাতত সাময়িকভাবে এক ভাবে বিন্যস্ত করে, চতুর্থ পদক্ষেপে দেখবো সেটি কত ভাল কাজ করছে, বা করছেনা। এখন পঞ্চম পদক্ষেপে এর দেয়া ফলাফলকে বাস্তবে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো। যেখানে মিলছেনা তার প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা আবার প্রথম, দ্বিতীয়, বা তৃতীয় পদক্ষেপে ফিরে গিয়ে তাতে পরিবর্তন এনে নূতন ভাবে দেখবো বাস্তব ফলাফলের সঙ্গে মেলার ক্ষেত্রে কোন উন্নতি হয়েছে কিনা। এভাবে কম্পিউটার সফ্টওয়্যার নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নানা জিনিস বদলিয়ে বদলিয়ে

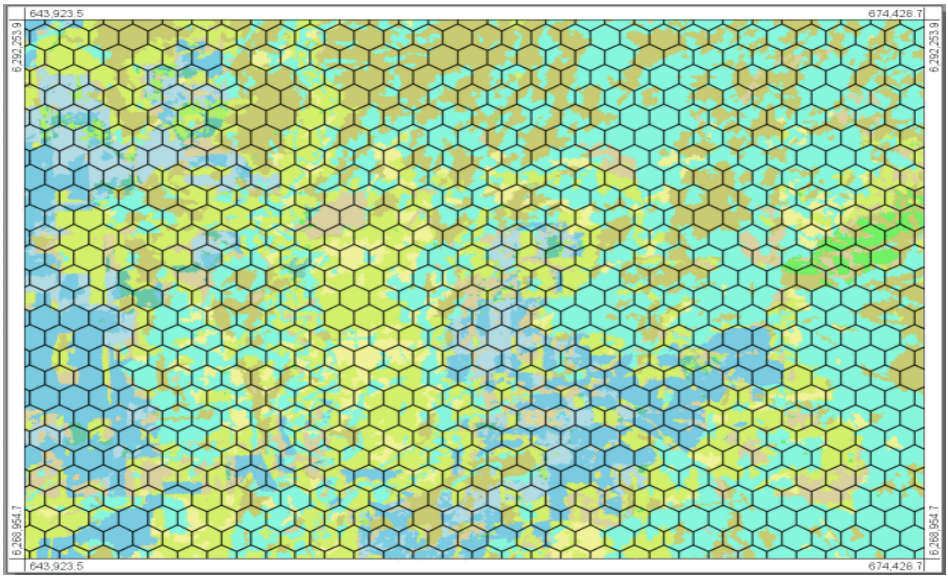

দৃশ্যপট মডেলিং এর জন্য ইতস্তত স্যাম্পল নেবার সরল ষড়ভূজ খোপের মৌচাক আকৃতির গ্রিড

মোটামুটি নিখুঁত একটি মডেলে পৌঁছতে পারে, যা বাস্তব ফলাফলের সঙ্গে মিলে যায়। ফলে এটি ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারবে যেই বাস্তব ফলাফল ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে তা।

শুরুতে যাঁরা দৃশ্যপটের ব্যবস্থাপনার মডেলিং শুরু করেছিল তাঁদের পদ্ধতিটি ছিল খুব সরল। তাঁরা মানুষের বন্টন বা মানুষের কর্মকাণ্ডের বন্টনটিকে দৃশ্যপটে প্রাধান্য দিয়েছেন। দেখা গেছে যে দৃশ্যপটের সকল সম্পদকে সর্বোত্তম ভাবে ব্যবহার করতে

গিয়ে মানব কর্মকাণ্ড ওতে প্রায় সমান ভাবে চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এতে এক একটি কেন্দ্রীয় স্থানের চতুর্দিকে ষড়ভূজের আকারে এক একটি অঞ্চল সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদী কর্মকাণ্ড ঐ কেন্দ্রীয় স্থানেই সংঘঠিত হয় এবং একে বলা হয় মুখ্য কেন্দ্র। এই মুখ্য কেন্দ্র আবার চারিদিকে কিছু দূরে বেশ কিছু গৌণ কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ স্বরূপ একটি গ্রামীণ দৃশ্যপটের কথা বিবেচনা করা যাক যেখানে গ্রামগুলো সর্বত্র কিছু দূরে দূরে সমভাবে বন্টিত হয়ে এরকম ষড়ভূজ মডেলের আকৃতি নিয়েছে। ধরা যাক প্রত্যেকটি ষড়ভূজের কেন্দ্রে রয়েছে এখানকার প্রধান পানি-উৎস– যেটি মুখ্য কেন্দ্র। আর একে ঘিরে প্রত্যেক জায়গায় রয়েছে কৃষি উৎপাদনের গৌণ কেন্দ্রগুলো। এমন ষড়ভূজগুলো চারিদিকে সমভাবে একের পর এক থেকে পুরো মডেলটিকে একটি মৌচাকের আকৃতি দেয়। এখন এই মডেলে দৃশ্যপটের ব্যবস্থাপনার কয়েকটি বিভিন্ন প্রকারভেদের প্রতিনিধিত্ব করা যায়। দৃশপটের সম্পদগুলো যদি সুসমভাবে চতুর্দিকে বিন্যস্ত থাকে এবং ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণটি যদি খুব বেশি কেন্দ্রীভূত থাকে তাহলে গৌণ কেন্দ্র গুলো মুখ্য কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি হবে। সেক্ষেত্রে সুসম ঐ মৌচাক গঠন অবিকৃত থাকে। কিন্তু যদি সম্পদগুলো অসমসত্ত্বভাবে এলোমেলো বন্টিত থাকে তখন দৃশ্যপটের খোপগুলো সুসম ষড়ভূজের আকৃতিতে না থেকে বরং বিষমবাহু বহুভূজের আকৃতি নেবে যার বাহুগুলো এক একটি একএক দৈর্ঘের। মোটাদাগে দেখতে গেলে সমসত্ত্ব ষড়ভূজগুলো বৃত্তাকার প্রতিসাম্য নেয় আর এই বিষমবাহু বহুভূজ অনেকটা লম্বাটে উপবৃত্তের রূপ নেয়।

মডেলিং এর ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে গবেষক দৃশ্যপটকে কীভাবে দেখছেন তা গুরুত্ব পায়। দৃশ্যপটের নানা প্রবাহ যদি সচ্ছন্দে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় তখন অনায়াসে ষড়ভূজ মৌচাক আকৃতির মডেল খাড়া করা যায়। কোন দিকে যদি দৃশ্যপটের স্বাভাবিক প্রবাহে বড় বাধা যাকে তা হলে মডেলটি সেই দিকে বিকৃত হয়ে যাবে। আবার যদি কোন একটি বিশেষ দিকে প্রবাহ দৃশ্যপটটিকে নিয়ন্ত্রণ করে– বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কোন করিডরের কারণে, যেমন বড় নদী, কিংবা যোগাযোগ পথ– তা হলে পুরো মডেলটিই ষড়ভূজের বদলে সেই দিকের সমান্তরালে অনেকটা রৈখিক রূপ পাবে।

আগেই দেখেছি মডেলের মাধ্যমে যদি আমরা দৃশ্যপট ব্যবস্থাপনায় আমাদের সর্বোত্তম করণীয় জানতে চাই তাহলে মডেলে ইনপুটগুলো পরিবর্তন করে করে দেখতে হবে তাতে আউটপুট কীভাবে পরিবর্তিত হয়। কোন ইনপুটের প্রতি আউটপুট খুব সংবেদনশীল হয় তা হলে সেখানেই হাত দিতে হবে আগে। সংবেদনশীল হওয়া মানে হলো ইনপুট একটু বদলালে আউটপুট অনেক বেশি বদলে যাওয়া। ধরা যাক এক একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার কাজের তীব্রতাকে ইনপুট হিসেবে নিয়ে আমাদের লক্ষ্য হলো চারণের মাধ্যমে গবাদি পশুর উৎপাদন উন্নয়ন। এভাবে একটি একটি করে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা তীব্রতাকে ইনপুট হিসেবে বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা গবাদি পশু উৎপাদনের আউটপুটে তার সংবেদনশীলতা লক্ষ্য করতে পারি। এর থেকে হয়তো সিদ্ধান্তে বেরিয়ে আসবে যে দৃশ্যপটের বর্তমান পরিস্থিতিতে পশু উৎপাদনের জন্য সর্বোত্তম পদক্ষেপ হবে শীতের সময় ঘাসের অবস্থা যখন ভাল নয় তখন চারণ ক্ষেত্রে পশু না চরিয়ে তাদেরকে সঞ্চিত খাবার খাওয়ানো। অবশ্য এই সংবেদনশীলতা নির্ভর করবে দৃশ্যপটের পরিস্থিতির উপর। উল্লিখিত উদাহরণে ঐ শীতকালীন চারণ নিষেধাজ্ঞার ফলে ঘাস উৎপাদন যদি ধরা যাক ১০% বাড়ে তা হলে চারণ ভূমিতে পশু উৎপাদনের উপর এর ভাল প্রভাব যত বেশি হবে ততই সংবেদনশীলতা বেশি। উর্বর

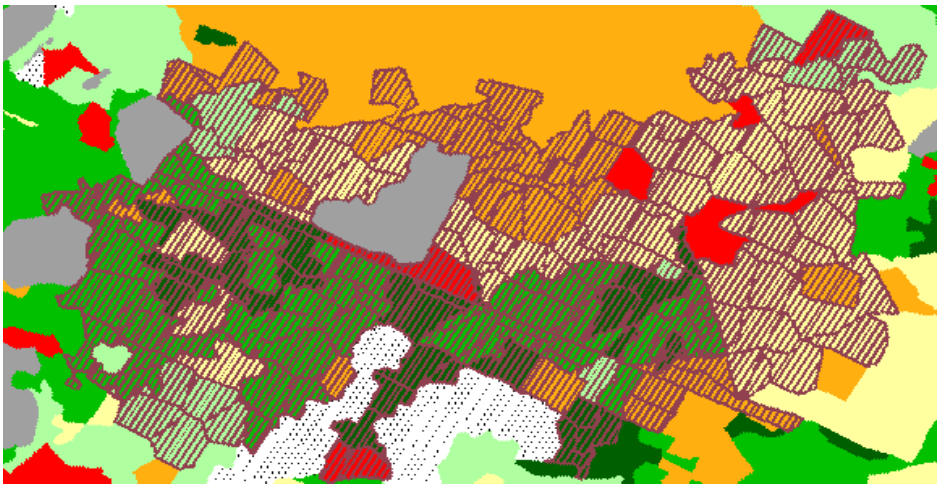

অসম বহুভূজ আকৃতিতে দৃশ্যপটের মডেলিং

চারণভূমিতে এটি যথেষ্ট হলেও অনুর্বর চারণভূমিতে ঘাসের এই ১০% বৃদ্ধি কিন্তু মোটেই যথেষ্ট কিছু হবে না। প্রথমোক্ত পরিস্থিতিতে ঐ বাড়তি ১০% ঘাসের পরিমাণ এত বেশি হবে যে পশুদের জন্য তা বাড়ন্ত হবে। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে তা কিন্তু হবেনা। একই ভাবে মডেলের আর একটি বড় কাজ হলো ব্যবস্থাপনার কোন বিশেষ সিদ্ধান্তের কারণে ফলাফলের উপর কী ঝুঁকি দেখা যায় তা নির্ণয় করা। অর্থাৎ কী বিশেষ ইনপুট মডেলে ঢুকালে আউটপুটে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, বাস্তবে সত্যি ওটি করার আগে বুঝতে পারার জন্যই তৈরি হয় মডেল।

দৃশ্যপটের ল্যাবোরেটরী

দৃশ্যপট ব্যবস্থাপনার জন্য গাণিতিক মডেলের মতই আর একটি জিনিস খুব কাজে আসছে তা হলো সার্বক্ষণিক ভাবে নিয়ামকগুলোকে সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে রেখে এক রকম ল্যাবোরেটরির মধ্যেই দৃশ্যপটের পরিবর্তনগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা। এর একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অন্য একটি উদ্দেশ্যে নেয়া বিজ্ঞানীদের কিছু পদক্ষেপ থেকে। ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে গিয়ে মানুষ যদি বসতি স্থাপন করে তখন সেখানে খোলামেলা অবস্থায় বাস করার সুযোগ হবেনা– কারণ এখানে বায়ুমণ্ডলের যে প্রকৃতি ও নিম্ন চাপ তাতে মানুষ বাঁচবেনা, ওখানকার নিম্ন উত্তাপও মানুষ সহ্য করতে পারবেনা। অন্যান্য

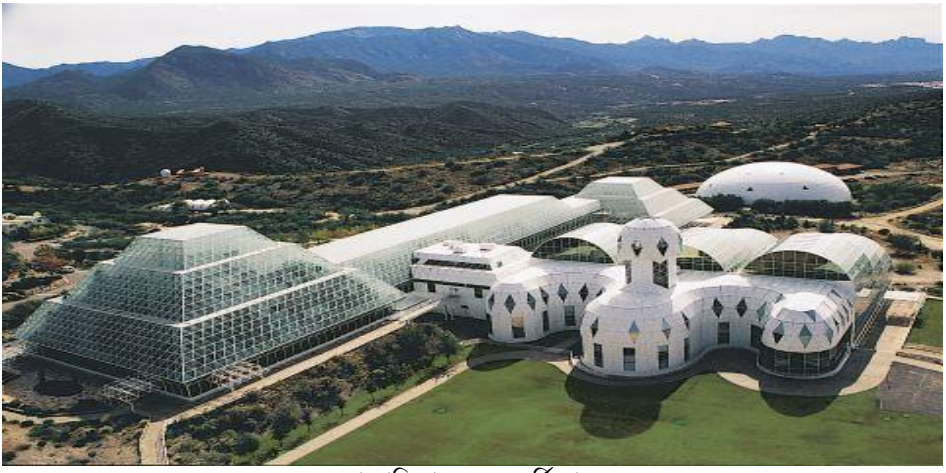

বায়োস্ফিয়ার-২ এর বর্হিদৃশ্য

নানা বিষয়ও মানব বসতির অনুকূল নয়। তাই সেখানে বসতি স্থাপনকারীদেরকে কিছু অঞ্চল জুড়ে নিজেদের জন্য একটি বদ্ধ অনুকূল আবহাওয়া স্থাপন করতে হবে। আরো ভাল হয় যদি বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সব রসদ ওর মধ্যেই চক্রাকারে তৈরি ও আবর্তিত হবার ব্যবস্থা করা যায় যাতে বাসিন্দারা নিজেরা সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। এসব আদৌ সম্ভব কিনা তার পরীক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনায় ছোট পরিসরে নানা দৃশ্যপটের একটি বদ্ধ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল ১৯৯১ সালে। এর নাম দেয়া হয়েছে বায়োস্ফেয়ার -২। আগেকার অন্য একটি ব্যবস্থাকে বায়োস্ফেয়ার-১ বলা হয়েছিল বলেই এটির এই নাম। এর মধ্যে সম্পূর্ণ ঢাকা ও সীলকরা অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে ছোট-পরিসরে ঘন বন (রেইন ফরেষ্ট), সাভানা তৃণ ভূমি, উর্বর চাষের ক্ষেত ইত্যাদি নানা দৃশ্যপট। এমনকি প্রবালকীটের কলোনি সহ একটি ছোট খাট সমুদ্রের দৃশ্যপটও ওখানে গড়ে তোলা হয়েছিল। সবই সম্ভব হয়েছে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে

বায়োস্ফিয়ার-২ এর অভ্যন্তরে ছোট আকারে দৃশ্যপট সমূহ

উপযুক্ত উত্তাপ, আর্দ্রতা, মাটি ইত্যাদি কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করে। শুরুতে কয়েকজন বাসিন্দাও দীর্ঘদিনের জন্য বসবাসের চেষ্টা করেছে এর মধ্যে– কৃত্রিম ভাবে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে। নানা সমস্যার কারণে ঠিক এভাবে প্রচেষ্টাটি সফল হয়নি। পরে প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিবর্তন এসেছে, অবয়বেও সেভাবে পরিবর্তন এসেছে।

এখন বায়োস্ফেয়ার-২কে ব্যবহার করা হচ্ছে দৃশ্যপট পরিবর্তনের ল্যাবোরেটরি হিসেবে। বিজ্ঞানীরা এখন নিজেরা টিকে থাকার এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য ওর ভেতর স্থায়ী ভাবে থাকছেননা, বরং একে বিভিন্ন নিয়ামক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করছেন। এখনো ওখানে রয়েছে খুব ছোট্ট পরিসরের নানা দৃশ্যপট– রেইন ফরেষ্ট, সাভানা তৃণভূমি, পাহাড়ী ঢাল, মরুভূমি– ইত্যাদি। পরীক্ষাগুলো খুব নিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। যেমন "পাহাড়ী ঢালের" মাটির কথাই ধরা যাক। প্রাচীন আগ্নেয় শিলাকে গুড়ো করে একে তিন বছরের মধ্যে প্রায় মাটির রূপে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ার কাজের মাধ্যমে। ঐ ছোট পরিসরের বিভিন্ন পাহাড়ী ঢালে উদ্ভিদ সহ সেই মাটি রাখা হয়েছে। আসলে ঐ ঢাল হচ্ছে কয়েকটি ট্রে মাত্র– নানা ভাবে কাৎ করে রেখে যার ঢাল ইচ্ছেমত পরিবর্তন করা যায়। পরে সেই ট্রে-গুলোকে ঐ বায়োস্ফেয়ার-২ এর মধ্যে দৃশ্যপটে নিয়ে যাওয়া হবে– কোনটি যাবে ওখানে সৃষ্টি করা মরুভূমির আবহাওয়ায় যাতে গ্রীষ্মে অতি স্বল্প বৃষ্টি বরাদ্দ, কোনটি যাবে ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ায় যেখানে শীতকালে

বায়োস্ফিয়ার-২ এর ভেতর নানা রকম ইকোসিস্টেম বা দৃশ্যপটের সমাবেশ, এবং ল্যবোরেটরী

ভাল বৃষ্টি, আবার কোনটি অন্য কোন আবহাওয়ায়। সবই অবশ্য ঐ বায়োস্ফেয়ার-২ এর ভেতরে নানা খোপে– যার আবহাওয়া আলাদা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। শুধু ছোট পরিসরে থাকা বা বিভিন্ন কৃত্রিম আবহাওয়ায় থাকাটাই আসল পাহাড়ী ঢালের সঙ্গে এই মাটি ও উদ্ভিদ ভর্তি ট্রের পার্থক্য নয়। প্রত্যেকটি ট্রের নানা অংশে সংযোজিত রয়েছে ১৩০০টি বিভিন্ন সেন্সর যা এক এক বিন্দুতে বিভিন্ন জিনিসের সূক্ষ্মে পরিমাপ রেকর্ড করছে– যেমন সেখানে কতখানি কার্বন ঢুকছে, আর কতখানি বের হচ্ছে তা। বায়োস্ফেয়ার-২ এর কিছু জায়গাকে এখন পুরোপুরি আবৃত অংশের বাইরে রাখা হয়েছে যাতে তা ঐ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় থাকতে পারে। ঐ উন্মুক্ত অংশেও রয়েছে কৃত্রিম কিন্তু বেশ বড় আকারের পাহাড়ী ঢাল– উপযুক্ত দৃশ্যপট সহ। দৃশ্যপট পরিবর্তনের ল্যাবোরেটরী হিসেবে এর ভূমিকাটিও কম নয়।

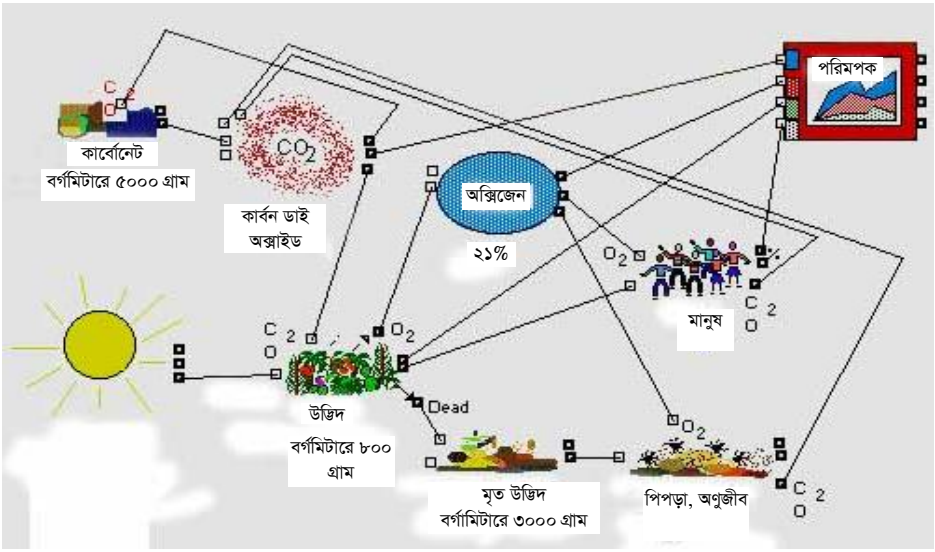

বায়োস্ফেয়ার-২ এর ল্যাবোরেটরীতে নানা জৈব প্রক্রিয়ার পরিমাপ

বিজ্ঞানীরা বলছেন পদার্থবিদরা যেমন অনেক পরিশ্রমে অনেক ব্যয়ে– জেনেভার সার্নে উচ্চ শক্তি কণিকা ত্বরকের ল্যাবোরেটরি গড়ে পদার্থবিদ্যায় যুগান্তর আনছেন, ইকোলজিষ্টরা সেভাবে তাদের এরকম ল্যাবোরেটরিতে গবেষণায় তাঁদের বিষয়েও যুগান্তর আনবেন। আগে তাঁরা তাঁদের বিষয়টিকে প্রধানত ইকোলজি হিসেবেই

দেখতেন। এখন কিছুকাল যাবত বেশি বেশি করে একে দৃশ্যপটের বিজ্ঞান হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইকোলজিকে বুঝতে হলে দৃশ্যপটের অন্তরালে কী ঘটছে সেটিই জানা প্রয়োজন, আর বিষয়টি আজকের বিজ্ঞানীর কাছে মূলত প্রতিভাত হচ্ছে দৃশ্যপট হিসেবেই। কাজেই এই বিজ্ঞানের ভাষাটি ক্রমে গড়ে উঠছে দৃশ্যপটের উপাদান – পটভূমি, টুকরা, করিডর; এদের মধ্যে প্রবাহ, আদান প্রদান; দৃশ্যপটের গড়ে ওঠা, বিপর্যয়, এবং পরিবর্তন নিয়ে।

প্রকৃতি-প্রেম: দৃশ্যপট বিজ্ঞানের একটি প্রেরণা

বায়োফিলিয়া

এই বইয়ের শুরুতেই আমরা দেখেছি যে মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট হলো প্রকৃতিপ্রেম আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে জীবপ্রেম, যা বায়োফিলিয়া নামে পরিচিতি হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণার ফলে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে গাছপালা জীবজন্তুর প্রতি মানুষের এই সহজাত আকর্ষণ নেহাৎ লাভক্ষতির বিষয় নয়। বিষয়টি মানুষের ডিএনএতে রয়েছে, এটি তার সম্পূর্ণ মননের সঙ্গে জড়িত। কয়েক মাসের শিশুর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওরা খেলনা, পুতুল ইত্যাদির নাচানাচি যতই পছন্দ করুক সব চেয়ে বেশি পছন্দ করে জ্যান্ত কোন কিছু– তা মানুষ, পুষি বিড়াল, ফড়িং যাই হোক। ঐটুকু বাচ্চার পক্ষে অন্যের কাছ থেকে শিখে এই পছন্দটি পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়,– এটি তার জন্মগত। তাছাড়া আমরা আগেই দেখেছি আর একটি পরীক্ষার কথা সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির গহীনে থাকা সব রকম মানুষের নমুনা নিয়ে তাদের প্রত্যেককে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সুযোগ পেলে তারা কী রকম পরিবেশে থাকতে পছন্দ করবে। তাদের সবার উত্তরের মধ্যে অদ্ভুত মিল দেখা গেছে–। এখন যে যেখানেই থাকুক না কেন– মহানগরের এপার্টমেন্টে, ধনী শহরতলীর বাগানবাড়ীতে, কৃষকের খামার বাড়িতে, বেদুঈনদের তাঁবুতে, গহীন জঙ্গলের ফাঁকের আদিবাসী পাড়াতে– তাদের সবার মনের মধ্যে যেখানে থাকতে পারার ইচ্ছেটি রয়ে গেছে তা হলো ফাঁক ফাঁক বৃক্ষ সুশোভিত মাঠ অনুচ্চ তৃণে ঢাকা, সামনে নদী, হ্রদ বা এমনি কোন জলাশয় যার মধ্যে মাছ, জলচর পাখি; বৃক্ষে পাখির কূজন, তৃণে খরগোস, মাঠে চরা বড় প্রাণি হরিণ, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি। অদূরে বনভূমি থাকলে মন্দ নয়, কিন্তু তা 'বসতির এলাকাতে নয়। স্পষ্টত এই পছন্দটির কারণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষাগত নয়, এটি মানুষ মাত্রেরই একান্ত সহজাত।

বায়োফিলিয়া (জীবপ্রেম) নাম দিলেও পরে দেখা গেছে বিষয়টিকে নেহাৎ জীবপ্রেম বল্‌লেও ঠিক হয়না, আসলে এটি এক রকম প্রকৃতি প্রেম যার বড় অংশ উদ্ভিদ ও প্রাণি– অর্থাৎ জীব। কিন্তু তার বাইরেও নদী, নালা, জলাশয়, বিশেষ ভূমি-রূপ, দিগন্ত রেখা, আলো-আঁধারের খেলা ইত্যাদিও তাতে স্থান পায়। কাজেই বায়োফিলিয়া

জিনিসটি সত্যিকার অর্থে যেমন জীবপ্রেম, তেমনি প্রকৃতি প্রেমও বটে। এই প্রকৃতি প্রেমের কারণও যে বিবর্তন তত্ত্বের নিরিখে ব্যাখ্যা করা গেছে তাও আমরা বইয়ের শুরুতে দেখেছি। মানুষ যখন পূর্ব আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমিতে আবির্ভূত হয়ে বিবর্তিত হচ্ছে, তখন সেখানকার পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের প্রতি আকর্ষণটি আমাদের ডিএনএতে স্থায়ী হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে অভিবাসন, ভিন্ন পরিবেশে বাঁচা, নগরায়ন, ইত্যাদি নানা ভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেতে হলেও সময়ের দিক থেকে এসবের কোনটিতে অতিবাহিত কাল তুলনামূলকভাবে তেমন দীর্ঘ নয় বলে সেগুলো মানুষের ডিএনএ'র অংশ হয়নি। ডিএনএতে রয়ে গেছে সেই সাভানা তৃণ ভূমিতে দীর্ঘ কাল ধরে বিবর্তিত হবার নীলনক্সাটি। অবশ্য একই কারণে মানুষের যে বায়োফোবিয়া বা জীব ভীতিও গড়ে উঠেনি তা নয়– হিংস্র পশুর ভীতি, বিষাক্ত সাপ বা পোকার ভীতি ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুতর হয়ে উঠলেও কিন্তু এই ভীতি মানুষের মৌলিক প্রকৃতি প্রেমকে দমাতে পারেনি।

হাসপাতালের শয্যার চারিদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য: এতে নিরাময় দ্রুততর হয়

মানুষের দেহমনের উপর প্রকৃতি প্রেমের প্রভাব

বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি প্রেম মানুষের ডিএনএতে অন্তর্ভূক্ত হবার মানে হলো প্রকৃতি প্রেম আদিতে মানুষের টিকে থাকা ও বংশ বিস্তারে ইতিবাচক ফল রেখেছিল। ডিএনএ'র মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবার ফলে ঐ একই বৈশিষ্ট আজও আমাদের দেহ-মনের উপর ইতিবাচক প্রভাব রাখছে– যা বিভিন্ন গবেষণায় ধরা পড়েছে। হাসপাতালের যে সব কামরা থেকে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়, বিশেষ করে উদ্ভিদ, প্রাণি ও জলাশয় ইত্যাদি নিয়ে যে কাম্য দৃশ্যের কথা উপরে বলা হয়েছে তেমনি দৃশ্য যদি দেখা যায়, তা হলে অসুখ সেরে উঠাটি ত্বরান্বিত হয়– গবেষণায় এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেখানে সত্যিকার এরকম দৃশ্য নেই, যেখানে কামরার জানালায় টেলিভিশন স্ক্রীন লাগিয়ে যদি এমন দৃশ্য দেখা যায়– তাতেও ত্বরান্বিত ভাবে সারার বিষয়টি অন্তত কিছুটা বজায় থাকে। একই বিষয় সাধারণ অফিসের জানালা থেকে দেখা দৃশ্যের ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয়েছে। সরাসরি জানালা দিয়ে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাওয়া, জানালায় বসানো টেলিভিশন স্ক্রীনে এমন দৃশ্য দেখা, এবং এর কোনটি না দেখে বাইরের দৃশ্যবিহীন কামরায় কাজ করা, এই তিনটির মধ্যে ঐ কামরায় কর্মরতরা প্রথমটিই বেশি পছন্দ করেন; এবং কর্মস্পৃহাও সে অবস্থাতেই ভাল দেখা যায়। দ্বিতীয়টিও অর্থাৎ স্ক্রীনের দেখা দৃশ্যও তাদের পছন্দের মধ্যে রয়েছে, যদিও সত্যিকার দৃশ্যের থেকে তা কিছু কম। কিছুদিন স্ক্রীনে এমন দৃশ্য দেখাবার পর সেটি বন্ধ করে দিলে ওখানকার কর্মরতরা কর্মপরিবেশে ঘাটতি অনুভব করেন, এবং স্ক্রীনটি আবার চালু করার অনুরোধ জানান। যে সব অফিসের ঠিক বাইরেই প্রাকৃতিক দৃশ্য সমৃদ্ধ সুন্দর চত্বর রয়েছে– অথচ অফিসের অনেক কামরার জানালা সেদিকে খোলা নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে বাইরে ক্যামেরা সংযোজন করে তা বিকল্প হিসেবে জানালায় স্থাপিত স্ক্রীনে দেখানো হলে প্রকৃত দৃশ্য না দেখার দু:খ অনেকটাই এভাবে মিটতে দেখা গেছে বিভিন্ন পরীক্ষায়। তবে এক্ষেত্রে দুটি সমস্যা থেকে যায়। একটি হলো দর্শক নিজের অবস্থানে পরিবর্তন এনে দৃশ্যটাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন না যা প্রকৃত দৃশ্যের ক্ষেত্রে সম্ভব। এই করতে পারাটি প্যারালাক্স বলে পরিচিত, এবং এটি না করতে পারলে দৃশ্যটিতে সামান্য কৃত্রিমতার ভাব আসে। আরেকটি অসুবিধা হলো অফিসের বাইরে ওরকম এলাকার কোন মানুষ আসা যাওয়া করলে ক্যামেরাবন্দী হয়ে অফিসের কামরায় কামরায় চলে যাওয়াটিকে কেউ কেউ

অফিস থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা না গেলে পর্দায় প্রজেক্ট করে সে দৃশ্য ফুটিয়ে তুললেও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

তাদের প্রাইভেসির বিঘ্ন ঘটায় বলে মনে করেন; যদিও অবশ্য সরাসরি দৃশ্য হিসেবে জানালা দিয়ে দেখা গেলে এই আপত্তি ওঠেনা। অবশ্য শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের অংশগুলোকে ক্যামেরার ফিল্ডে রাখার উপর গুরুত্ব দিলে এই আপত্তিটি কমে যায়।

প্রকৃতি প্রেমের সঙ্গে মানুষের দেহ-মনের ও কর্মস্পৃহার সম্পর্কটি পরীক্ষিত হবার পর এখন তার সুবিধাটুকু নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর একটি হলো হাসপাতালের পরিবেশে প্রকৃতিকে যোগ করে রুগীর দ্রুত আরোগ্যে সহায়তা দেয়া। যেখানে সম্ভব সেখানে সরাসরি প্রাকৃতিক পরিবেশকে সৃষ্টি করে তা হচ্ছে, অথবা ওরকম পরিবেশেই হাসপাতালটি স্থাপন করা হচেছ। অন্যত্র তা স্ক্রীনে প্রজেকশন করে প্রযুক্তির সাহায্যে করা হচ্ছে– তাতেও যথেষ্ট কাজ হচ্ছে। অফিসের কর্ম পরিবেশের কথা তো বলাই হলো।

ন্যাশনাল পার্ক

দৃশ্যপট উন্নয়নে প্রকৃতি প্রেম

শুধু অর্থনৈতিক এমনকি পারিবেশিক খাতিরে নয় বরং মানুষকে প্রকৃতিপ্রেমের সুযোগ দেয়ার জন্য এবং তার দেহ মনের উপর এর ইতিবাচক ফলাফলগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে; নি:সন্দেহে ভবিষ্যতে আরো অনেক নেয়া হবে। দেশে দেশে ছোট বড় যে ন্যাশনাল পার্ক, নেচার রিজার্ভ বা অভয়াশ্রমগুলো গড়ে উঠছে এই উদ্দেশ্যটিও তার পেছনে কাজ করছে। যদিও অভয়াশ্রম বা পার্কগুলোর অবশ্যকরণীয় হিসেবে একটি লক্ষ্য থাকে জীববৈচিত্রকে সুরক্ষা দেয়া, বিশেষ করে বিরল উদ্ভিদ ও প্রাণিদের একটি নিরাপদ আবাস দেয়া; একই সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়া। তার প্রকৃতি প্রেমকে আরো জাগ্রত করে মানুষের দেহ-মনের উৎকর্ষ সাধনও এর একটি লক্ষ্য। এ জন্য উভয় লক্ষ্যের মধ্যে সংঘাত যেন না ঘটে তারও নানা বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন অভয়াশ্রমের একটি কেন্দ্রীয় অংশ মানুষের অগম্য রাখা হয় শুধু বিজ্ঞান গবেষণার প্রয়োজনে ছাড়া। এর বাইরে একটি অংশ আগ্রহী ও সতর্ক পর্যটকদের জন্য শুধু উন্মুক্ত রাখা হয় যাতে উদ্ভিদ ও প্রাণির ক্ষতি না করেই তারা প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে পারে। আর এরও বাইরে রাখা হয় পর্যটকদের বাসস্থান, বিনোদন, শিক্ষামূলক

কার্যক্রম ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা। সবমিলে ন্যাশনাল পার্ক বা অভয়াশ্রমের দুটি লক্ষ্যই পূরণ হবার ব্যাপারে পরস্পরের একটি সহযোগিতা গড়ে উঠে।

প্রকৃতি রিজার্ভ বা অভয়াশ্রম

এই ধরনের ন্যাশনাল পার্ক ইত্যাদি অনেক দেশে এখন তত চমৎকার ও ব্যাপক ভাবে নেয়া হচ্ছে যে এগুলো বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটন শিল্প ইকোট্যুরিজম গড়ে তুলেছে। ইকোট্যুারিজম এখন পর্যটনশিল্পের অন্যান্য সব শাখাকে ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। সুযোগ দিলে মানুষের প্রকৃতিপ্রেম যে প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার সব চেয়ে বড় প্রেরণা হয়ে উঠতে পারবে ইকোট্যুরিজম তার একটি বড় প্রমাণ। দৃশ্যপটের আলোচনায় মানুষের হস্তক্ষেপ যে নানা বিপর্যয় ও অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এই নূতন প্রবণতা তাতে এখন বাধ সাধছে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ভাবে ইতিবাচক হওয়াতে ভবিষ্যতেও এই প্রবণতা টেকসই হবার ও আরো বিকশিত হবার চমৎকার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমরা বিশ্বজুড়ে দৃশ্যপটের নানা বৈচিত্র লক্ষ্য করেছি– এর মধ্যে কতগুলো মানব বসতি বা মানব জীবনের জন্য খুব অনুকূল, অন্যগুলো নয়। কিন্তু বর্তমানের সমৃদ্ধ মানুষ শুধু ঐ অনুকূল দৃশ্যপটকেই তার প্রকৃতি প্রেমের লক্ষ্যবস্তু করেনা– বরং সব ধরনের দৃশ্যপটকে এমনকি খুব বিরল এবং বসতের জন্য খুব রুক্ষ এমন চরম দৃশ্যপটকেও উপভোগ করে। তাই এক সময় পর্যটনের জন্য নয়নাভিরাম দৃশ্যপটগুলো বলতে যা বুঝাতো সেই সাগর ধার, তৃণ ভূমির সাফারি পার্ক, দূরে বরফ

ইকোট্যুরিজম

ঢাকা পর্বত শৃঙ্গ আর কাছে হ্রদ– ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন ইকোট্যুরিজমের জনপ্রিয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে– গহীন রেইন ফরেষ্ট, মালয়েশিয়ার পাম বাগান সংলগ্ন ওরাং ওটাংদের জন্য সংরক্ষিত বন, নদী-কাদা আর শুলোয় ভর্তি ম্যাংগ্রোভ, ধূধূ মরুভূমির বালিয়াড়ি, মধ্য আমেরিকার দেশ বেলিজে চাষের ক্ষেতের সংলগ্ন বৃক্ষ সারিতে বিরল প্রজাতির বানর হাউলার মানকির আবাস– ইত্যাদি সব কিছু। এটি অত্যন্ত সুলক্ষণ অবশ্যই, মানুষের প্রকৃতি প্রেমের সঙ্গে জীববৈচিত্র সংরক্ষণের আবশ্যকতার চমৎকার সম্মিলন।

তবে প্রকৃতি প্রেমের রূপায়ন ঘটাবার জন্য শুধু এ রকম দূরবর্তী পর্যটন স্থল বেছে নিলে চলবে কেন? মহানগরীর অতি ঘন নিবাসে প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে যারা দিনের পর দিন বাস করছে তাদের প্রকৃতি প্রেমের কী হবে? এই সমস্যা সমাধানে পথ দেখাচ্ছে আজকের বেশ কিছু প্রকৃতি প্রেমিক নগরীর মানুষরা। তাঁরা নিজেদের নগর পরিকল্পনার মধ্যে সন্নিবেশিত করছেন প্রকৃতি প্রেমের অনেক উপাদান, এবং জীববৈচিত্র ধারণ করার অনেক উদ্যোগ। নগরীর মাঝখান দিয়ে প্রাকৃতিক ভাবে সুশোভিত অনেকগুলো পায়ে হাঁটা পথ, ভবনগুলোর ছাদ, সামনে পল্লবিত ফুলের বাগান, সর্বত্র অনেকগুলো জীব-বৈচিত্রে সমৃদ্ধ পার্ক ইত্যাদি নানা কিছুর মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ নরওয়ের অসলো এমনি একটি নগর– যা একেবারে কাছেই কয়েকটি

পাহাড়ী বনে ঘেরা, মাঝে বইছে সাতটি নদী, আর পুরো নগর যেন পার্ক আর সবুজ জায়গার সমারোহ। জনসংখ্যার চাপ ও স্থানের অভাবের দিক থেকে অসলোর চেয়ে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থাকা সিঙ্গাপুরের বিষয়টি আরো লক্ষণীয়। এই অতি ব্যস্ত নগরীর সর্বত্রও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে প্রচুর পার্কের আর তাদের সংক্ষেপ করে চমৎকার জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ করিডরের। শহরের আশপাশেই রয়েছে প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য। ছাদে ছাদে গড়ে তোলা হয়েছে কম্যুনিটি গার্ডেন। যেখানে অন্যরা গড়ে ইট পাথরের দেয়াল সিঙ্গাপুরবাসী সেখানে গড়েছে সবুজ দেয়াল। পৃথিবীর আরো অনেক বড় বড় নগরী এদের অনুসরণের চেষ্ট করছে।

ইকোট্যুরিজম

নগরের ব্যস্ততা, ভীড়, ও নিত্যাকার সংগ্রামের ভেতরও এই দৃশ্যপট ব্যবস্থাপনা এসব নগরকে দিয়েছে একটি চমৎকার আনন্দের খোরাক, এর মধ্যেও প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে তার স্বাদ নেবার সুযোগ। এভাবে কোটি কোটি মানুষ আজকের আধুনিক যান্ত্রিক প্রযুক্তির পূর্ণ সুযোগ নেবার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারছে মানুষের আদিম আকাঙ্খা পূরণের সুখের মধ্যে– সেই মানব আবির্ভাব দিনের আফ্রিকান সাভানার পরিবেশে থাকার সুখ। আদিমতম ও আধুনিকতম এই দুইয়ের অপূর্ব সম্মিলন যখন নিজের দৃশ্যপটের মধ্যে রূপায়িত হয় তখনই তো সৃষ্টি হতে পারে সব চেয়ে কাম্য ও টেকসই পরিস্থিতি– মানুষের জন্যও বটে, পৃথিবীর জন্যও বটে।